মহুয়া-মিলন

শ্রীনীরদ ভট্টাচার্য

পরিবেশক :—

কারেণ্ট বুক সপ

৫৭এ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

মহুয়া-মিলন

উৎসর্গ

সাহিত্যরসিক বন্ধুবৎসল

মেদিনীপুরের স্বনামধন্য চিকিৎসক—

ডাঃ উষানাথ সেনগুপ্ত

করকমলেষু।

ধীরাজ ভট্টাচার্য্য

এই লেখকের লেখা :—

যখন পুলিশ ছিলাম (৩য় মুদ্রণ)
যখন নায়ক ছিলাম (২য় মুদ্রণ)
সাজানো বাগান

ব্যতিক্রম

বর্ষাদিনের অবিশ্রাম একঘেয়ে টিপটিপে বৃষ্টির মত বিরক্তিকর মন্থর গমনে গোমো-ডিহিরি-অন-শোন প্যাসেঞ্জার ট্রেন রাঁচী থেকে রাত প্রায় পৌনে দশটায় ছেড়ে টিগিয়ে টিগিয়ে সব ষ্টেশন ছুঁয়ে নিজের মনে চলেছে। সাধারণতঃ এই ট্রেনটায় ভিড় বেশি হয় না। প্রথমতঃ সময়ের কোনও মা-বাপ নেই—কোন্ ষ্টেশনে কতক্ষণ থামবে কখন আবার দয়া করে ছাড়বে ভগবানও বলতে পারেন না। দ্বিতীয়, আর সবচেয়ে মারাত্মক কারণ হল, রাতে ফাঁকা গাড়িতে চোর-ডাকাত বদমায়েসের উপদ্রব। একটু ঘুমিয়ে পড়লেই হয় যথাসর্ব্বস্ব চুরি যাবে, নয়তো ওভার ক্যারেড হয়ে বিশ-পঞ্চাশ মাইল দূরে গিয়ে ঘুম ভেঙে বুক চাপড়াতে হবে। বেশি টাকা-কড়ি কাছে থাকলে হয়তো ঘুমই আর ভাঙবে না।

তৃতীয় শ্রেণীতে তবু কিছুটা লোকজন থাকবে এই আশায় একখানা টিকিট কিনে লেডিস কম্পার্টমেণ্টে সোজা উঠে পড়ে দেখল অচলা, ছুটি হিন্দুস্থানী মেয়ে ছাড়া সারা গাড়িটাই ফাঁকা। খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়ে একটা খালি বেঞ্চের উপর ছোট সুটকেশটা রেখে চুপচাপ বসে পড়লো অচলা। মনে মনে হিসেব করে দেখলো, খুব দেরিও যদি হয়, সকাল পাঁচটার মধ্যে ডালটনগঞ্জ পৌঁছুতে পারবে অনায়াসে। শর্বরী বলে দিয়েছে, ষ্টেশনের খুব কাছেই ওদের বাসা—তা ছাড়া ওর শ্বশুর ওখানে অনেক দিন আছেন—নাম করলেই সবাই চিনবে, কোনও অসুবিধে হবে না।

পাতলা ছাপা শাড়ীতে আবক্ষ ঘোমটা টেনে হিন্দুস্থানী মেয়ে ছু'টি দেহাতি ভাষায় কি সব রসিকতা করে হেসে গড়িয়ে পড়ছে। সেদিকে

কিছুক্ষণ চেয়ে মুখ ফিরিয়ে জানালার বাইরে তাকাল অচলা। থমথমে কালো মেঘে আকাশ ঢাকা—আসন্ন ঝড়-বৃষ্টির পূর্ব্বাভাস। পরের ষ্টেশনটা বোধ হয় একটু দূরে—ট্রেন বেশ স্পীডে নিরন্ধ্র অন্ধকারের বুক চিরে ছুটে পালাচ্ছে। অচলার মনে হল, অতীতের ফেলে-আসা দিনগুলোও ঐ সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটে চলেছে।...

বাপ-মাকে ভাল করে মনে পড়ে না। ছেলেবেলা থেকে মামা-মামীর কাছেই মানুষ। মামার একপাল ছেলে-মেয়ের সঙ্গে পাঠশালায় পড়া, একটু বড় হতেই তাও বন্ধ হয়ে গেল। দশ-এগারো বছর থেকেই মামার সংসারে রান্না থেকে শুরু করে যাবতীয় কাজ পড়ল অচলার ঘাড়ে। পান থেকে চূণ খসলেই মামীর হাতে প্রহার। লোক-মুখে শোনা—ঐ গাঁয়েরই শেষ প্রান্তে অচলাদের পাকা বাড়ি, জমাজমি, পুকুর সবই ছিল। মাত্র এক দিন আগে-পাছে মা-বাবাকে কলেরায় গ্রাস করার পর, মামা অতুল চাটুয্যে চার বছরের মেয়ে অচলাকে নিজের সংসারে নিয়ে আসেন। মামা-মামীর মুখেই শুনেছে, দেনা শোধ করতে ওদের বাড়ি-ঘর সবই বিক্রি হয়ে গেছে। পাড়ার লোক কিন্তু অন্য কথা বলে। যাক সে কথায়।

এত দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও অচলার একমাত্র সান্ত্বনা ছিল—পাশের বাঁড়ুয্যে-বাড়ির মেয়ে ইতি। ইতি অচলার সমবয়সী। শত কাজের মধ্যেও দিনান্তে একবার অন্ততঃ দু'জনে দেখা করে সুখ-দুঃখের কথা কইতো। হঠাৎ এক দিন ইতির বিয়ে হয়ে গেল। শুধু সেই দিন অচলার মনে হল, এ সংসারে সত্যিই সে বড় একা।

গাঁয়ের লোক বলত, অচলার চেহারা নাকি খুব ভাল আর এইটেই অচলার গুণ হয়েও দোষ হল। মামী যখন-তখন শুনিয়ে বলত, গরীবের ঘরে আবার রূপ কি লা? সারা দিন যাকে হেঁসেল ঠেঙিয়ে, বাসন মেজে, গোবর নিকিয়ে কাটাতে হবে, তার আবার চেহারা দিয়ে হবে কি!

অত অযত্নে অবহেলাতেও কিন্তু মামীর শাসনকে উপেক্ষা করে দিন-দিন অচলার দেহে লাবণ্য ও যৌবনের জোয়ার শুরু হয়ে গেল।

অদৃষ্ট-দেবতার বক্রদৃষ্টি পড়ল সেই সময় থেকে। গাঁয়ের দুষ্টগ্রহ ছিল ওপাড়ার দাশু ঘটক। ছেলেরা বলত—ব্যাটার নাম করলে হাঁড়ি ফাটে, মুখ দেখলে সাপে কাটে। তেজারতি ছাড়াও জমাজমি গহনা বন্ধক রেখে প্রচুর টাকা করেছে দাশু। রোগা ডিগডিগে হাড়-বের-করা চেহারা, বয়েস পঞ্চাশ পেরিয়ে গেলেও বোঝবার উপায় নেই, দশ বছর আগেও যা এখনও তাই। বয়েস যেন দাশুর কাছে টাকা ধার করে সুদের সুদ তস্য সুদে জড়িয়ে পড়ে ওর দেহসিন্দুকে আটকে পড়ে আছে। হাড় কেপ্পণ দাশু, ক্ষেতের মোটা চালের ভাত ডাল আর মাঝে-মধ্যে চুনো মাছের ঝোল—এ ছাড়া অন্য কিছু রান্না হতে কেউ দেখেনি দাশুর বাড়িতে। পরনে আট হাত কাপড়, খালি গা, কাঁধে গামছা—ব্যস, ঘরে বাইরে দাশুর এই হল বেশভূষা। মিশমিশে কালো দেহের ওপর কাঁধের পাশ দিয়ে ঝোলান ইয়া ধবধবে সাদা মোটা পৈতের গোছা। দুষ্টু ছেলেরা বলত—ভিন গাঁয়ে সুদের তাগাদায় যেতে হয়, পাছে কেউ ছোট জাত মনে করে মার-ধোর দেয়—সেইজন্যে।

তা সে যে জন্যেই হোক—দু'বেলা সন্ধ্যা-আহ্নিক না করে জল খেত না দাশু। তিনটে বিয়ে কিন্তু একটিরও ছেলে পিলে হল না—এই ছিল দাশুর মস্ত অভিযোগ বিধাতার কাছে। গাঁয়ের লোক আড়ালে আবডালে বলাবলি করত—সকাল-সন্ধ্যে সুদের তাগাদায় এ গ্রাম সে গ্রাম ঘুরে দাশু চতুর্থ পক্ষের জন্য একটি বয়স্কা পাত্রী খুঁজে বেড়ায়।

—কৈ রে—অতুল আছিস নাকি?

রান্না করতে করতে চমকে উঠল অচলা। এ গলা একবার শুনলে ভোলা শক্ত। ছেঁড়া ময়লা শাড়ি খানা জড়িয়ে মড়িয়ে বসল অচলা।

মামা ঘরের মধ্যে ছিলেন। তাড়াতাড়ি নেমে উঠোনে এসে দাওয়া থেকে একটা বেতের মোড়া নিয়ে পেতে দিয়ে বললেন,—বস খুড়ো! আজ এত সকাল সকাল বেরিয়ে পড়েছ যে?

লোলুপ দৃষ্টিটা রান্নাঘরের অন্ধকার ভেদ করে কা'কে যেন খুঁজে বেড়ায়। বসতে বসতে দাশু বলে,—তোমাদের আর কি ভায়া,

দাশু ঘটক আছে। দায়ে বেদায়ে হাত পাতলেই টাকা। এদিকে সেই টাকাটা যে আসে কোথা থেকে তা একবার ভেবে দেখো না। যাকগে, যা বলতে এসেছি, আসল পড়ে মরুক—সুদের প্রায় তিনশো টাকা হতে চললো—সেটার কি করছ ?

অতুল বললেন,—অবস্থা সবই তুমি জান খুড়ো! একপাল ছেলেপিলে, তার উপর এ বছর একপালি ধানও পাইনি জমি থেকে—ছেলেগুলোর ইস্কুলের মাইনে—

খুড়োর দৃষ্টি অনুসরণ করে মাঝ পথে থেমে যান অতুল বাবু, তারপর চেঁচিয়ে ওঠেন,—অচি, অচি। কোথায় গেলি রে ?

রান্নাঘর থেকে উত্তর দেয় অচলা—কি মামা!

—কি মামা! ভেংচি কেটে ওঠেন অতুল বাবু। অচলার উদ্দেশে তেমনি চড়া গলায় বলেন,—তোদের কি আক্কেল হবে না কোনও দিন ? তোর মামীর কাল রাত থেকে জ্বর, উঠতে পারছে না বেচারি, ছেলেগুলো একজামিনের পড়া করছে কিন্তু তুই তো রয়েছিস ?

কিছু বুঝতে পারে না অচলা। বলে—কি মামা ?

—একখানা হাতপাখা! দেখছিস লোকটা এতখানি পথ হেঁটে একেবারে গলদঘর্ম হয়ে এসেছে।

নিঃশব্দে ঘর থেকে একখানা তাল পাতার পাখা এনে পিছন থেকে দাশুকে হাওয়া করতে লাগে অচলা।

গলায় প্রসন্নতার আমেজ ফুটে ওঠে দাশুর। খপ করে অচলার হাত থেকে পাখাখানা নিয়ে নিজেই হাওয়া করতে করতে বলে,—বাঃ, দিব্যি ডাগর-ডোগরটি হয়ে উঠেছিস তো ?

নির্লজ্জের মত লোভী দৃষ্টিটা অচলার সারা দেহের ওপর বুলাতে বুলাতে অতুলকে বলে,—রান্নাবান্না সব কিছু ঐ করে বুঝি ?

—গরীবের ঘরে না করলে চলবে কেন খুড়ো! কি ভাগ্যি নিয়ে জন্মেছে হতভাগী! ছেলেবেলায় মা-বাপকে খেয়েছে—বিষয়-আশয় যা ছিল—চলে যেত, কিন্তু কে জানতো যে তলে তলে সব তোমার

কাছে বন্ধক দিয়ে গুণধর ভগিনীপতি আমার কলকাতায় ঘোড়দৌড়ের মাঠে সব খুইয়ে বসে আছেন !

অস্বস্তি ভরে নড়ে চড়ে বসে দাশু, বলে,—থাক থাক অতুল, সে সব পুরোনো কথা ওকে বলে লাভ কি ?

—সঙের মত ঘাড় গুঁজে দাঁড়িয়ে রইলি কেন ? যা না, খুড়োকে এক কলকে তামাক সেজে দে না হতভাগী !

দাওয়ার ওপর তামাক সাজার সরঞ্জাম। ধীরে ধীরে ওপরে উঠে তামাক সাজতে বসে অচলা। পিছনে না চেয়েও বেশ বুঝতে পারে, সার্চ্চলাইটের মত দাশুর অন্তর্ভেদী দৃষ্টিটা ওকে অনুসরণ করেই চলেছে।

হঠাৎ সামনে হুমড়ি খেয়ে পড়তে পড়তে কোনও রকমে তাল সামলে নিল অচলা। ব্যাপার কি ? ট্রেন ছাড়ল। অচলার মনে হল—দীর্ঘ পথশ্রমে ক্লান্ত নির্জীব লৌহদানব ঘুমিয়ে পড়েছে। মানুষ ঘুমোয় নি—চুলের মুঠো ধরে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে চলেছে ওকে ওদেরই ছকপাতা নির্দ্দিষ্ট সীমারেখায়। বাইরে ঠাণ্ডা হাওয়ার সঙ্গে পিট পিটে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে অনেকক্ষণ থেকে, অচলার খেয়ালই ছিল না। কাছে দূরের স্বল্পালোক ল্যাম্প-পোষ্টগুলোর কালি-পড়া কাচের ওপর লাল অক্ষরে ষ্টেশনের নাম লেখা,—অস্পষ্ট। অনেক কষ্টে পড়ল অচলা—ম্যাকক্লাসকিগঞ্জ—কী অদ্ভুত নাম রে বাবা ! জানালায় হেলান দিয়ে চোখ বুজে বসল অচলা। বৃষ্টির ঝাপটা চোখে-মুখে মাথায় পিচকারির মত ছিটকে এসে পড়ে। খুব ভাল লাগছিল অচলার।

ছিন্ন সুতোয় গ্রন্থি দিয়ে আবার শুরু হয় সেলাই···

প্রায় দু'বছর বাদে শ্বশুরবাড়ি থেকে বাড়ি এসেছে ইতি। সংসারের কাজকর্ম্ম শেষ করে অনেক রাত অবধি দু'জনে সুখ-দুঃখের কথা কইল—শেষে ইতিই এক রকম জোর করে অচলাকে বাড়ি পাঠিয়ে দিল, বললে—রাত অনেক হল, এবার বাড়ি যা মুখপুড়ি, ভোর না হতেই তো আবার হেঁসেলে হাঁড়ি ঠেলতে বসবি।

শোবার ঘর বলতে একখানি, মামা-মামী একপাল ছেলেপিলে নিয়ে সেইখানায় থাকেন। পাশে ছোট এক ফালি ভাঁড়ার ঘর—সেইখানে কোনও মতে একটা মাতুর বিছিয়ে থাকে অচলা। ঘরে ঢুকতে গিয়ে মামীর কথায় থমকে দাঁড়াল অচলা, প্রথমতঃ এত রাত অবধি কোনও দিনই জেগে থাকেন না—তার উপর তার কথা নিয়ে রাত জেগে কি এমন আলোচনা হতে পারে?

মামী—বিদেয় তো করছ অচিকে, কিন্তু তোমার এই শোরের পালকে দুবেলা পিণ্ডি রেঁধে দেবে কে? বাসন মাজা কাপড় চোপড় কাচা এসবই বা হবে কি করে?

মামা—আ হা হা—সে সব কি না ভেবেই এ কাজে হাত দিয়েছি মনে কর? বিয়ের আগে রীতিমত দলিল রেজেষ্ট্রি করে তোমার নামে অচির বাড়ি বাগান জমি জমা যা কিছু আছে সব লিখে দেবে দাশু খুড়ো। তখন ও পাড়ার রাখুর মা—তিন কুলে কেউ নেই, ওকেই পেটভাতা রেখে দেওয়া যাবে—বড় জোর মাসে এক টাকা হাত খরচ।

মামীর নামে রেজেষ্ট্রি হবে শুনে আগুনে জল পড়ল; রুক্ষ কর্কশ গলায় কড়ি-মধ্যমের মিঠে সুর বেজে উঠল—ছ্যাখো! তুমি যা ভাল মনে কর তাই কর। এতটুকু বয়েস থেকে মেয়েটাকে কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছি—ও চলে যাবে শুনলে তাই কেমন মায়া লাগে।

দাশুর সঙ্গে বিয়ে হবে? সমস্ত শরীর ঘেন্নায় রি-রি করে উঠল অচলার। তার চেয়ে গলায় কলসী বেঁধে মিত্তিরদের এঁদো পচা ডোবায় ডুবে মরা ঢের ভালো। ছেঁড়া মাতুরে শুয়ে বাকি রাতটুকু ছটফট করে কাটাল অচলা। সম্ভব অসম্ভব নানা রকম চিন্তা করেও মামা-মামীর চক্রব্যূহ ভেদ করে বেরিয়ে আসার পথ খুঁজে পেল না শুধু একটি পথ ছাড়া। পরদিন ভোরে খিড়কির পুকুরে ইতিকে একা দেখে হাত দুটো ধরে একরকম কেঁদে ফেললে অচলা,—সই! যে ভাবে হোক খানিকটা বিষ আমায় যোগাড় করে দিতেই হবে।

অবাক হয়ে মুখের দিকে চেয়ে ইতি বললে—মাত্র এই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এমন কি ঘটল যে—

সব বলে গেল অচলা। শুনে গম্ভীর হয়ে কিছুক্ষণ ভাবল ইতি, তারপর বললে,—কবে বিয়ে ?

অচলা,—সামনের শনিবার।

—ঠিক জানিস তুই ?

—হ্যাঁ, একেবারে পাঁজিপুঁথি দেখে সব পাকা বন্দোবস্ত ; এরকম একটা শুভ কাজ—ভাল দিনক্ষণ না দেখে হয় কি ?

ইতি বললে,—আজ হল মঙ্গলবার, হাতে রইল শুধু তিনটে দিন, ঠিক আছে।

কিছু বুঝতে না পেরে অচলা বলে—কি ঠিক আছে ?

হেসে জবাব দেয় ইতি,—বিষ আমি দেব না তোকে, দেব গোটা দশেক টাকা।

—তোর ছ'টি পায়ে পড়ি সই—এ সময় ঠাট্টা করিসনে। সত্যি কোনও উপায় থাকে তো বল।

—উপায় নিশ্চয়ই আছে কিন্তু খুব শক্ত, সাহস হবে তোর ?

হাসি পেল অচলার, বললে,—বিষ খেয়ে মরবার সাহস যার আছে তার সাহসে সন্দেহ হচ্ছে কেন তোর ?

ইতি বললে, আজই আমি কলকাতায় চিঠি লিখে দিচ্ছি—কাল না হোক পরশু সকালে পাবেই। এ ক'দিন কিছু করতে হবে না তোকে, লক্ষ্মী-মেয়ের মত মুখ বুজে চুপচাপ থাকবি। পাকা দেখা হয়ে যাক। বিয়ের আগের দিন একটু বেশি রাত্রে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসছিস বলে বাড়ি থেকে বেরুবি—কেউ সন্দেহ করবে না। পথে বেরিয়ে সোজা পুব দিকে হাঁটতে শুরু করবি ষ্টেশনমুখো !

অচলা বলে—কিন্তু ষ্টেশনের পথ তো পশ্চিম দিকে।

—তা জানি রে মুখ্যু ! সে ত হল আমাদের গাঁয়ের ষ্টেশন—মাত্র মাইল খানেক হাঁটলেই পৌঁছান যায়। তোকে যেতে হবে উল্টো পাঁচ মাইল হেঁটে নওপাড়া ষ্টেশন। ঠিক ভোরে কলকাতার গাড়ি পাবি। একখানা টিকিট কেটে লেডিজ কামরায় উঠে বসবি, ব্যস্।

পরিষ্কার কিছুই বুঝতে পারে না অচলা—ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়ে থাকে ইতির মুখের দিকে। বেশ একটু রেগেই বলে ইতি,—এটা বুঝতে পারলি নে বুদ্ধির ঢেঁকি—যে গাঁয়ের ষ্টেশন দিয়ে যেতে গেলে চেনা-শুনো কেউ না কেউ দেখে ফেলবেই—জানাজানি হবে, ওরা তোকে জোর করে আটকে রাখবে। নওপাড়া অনেকটা দূর—সেখান দিয়ে যাওয়াই নিরাপদ।

অচলা বললে—বেশ, গাড়িতে উঠে বসলাম, তারপর ?

—তার পরের ভাবনা আমার। সেই জন্যেই আজ কলকাতায় চিঠি দিচ্ছি। আমার দেওর নিখিল এবার মেডিকেল কলেজ থেকে পাশ করে ওখানেই হাউস সার্জেন হয়েছে। আমাদের বাড়ির খুব কাছেই নার্সেস কোয়ার্টার। বুঝতে পারছিস কিছু ?

ঘাড় নাড়ে অচলা।

হেসে ইতি বলে,—অজ পাড়াগাঁয়ে থেকে তোর বুদ্ধিসুদ্ধি সব ভোঁতা হয়ে গেছে। মন দিয়ে শোন। শিয়ালদা ষ্টেশনে নিখিল থাকবে—তোকে চিনে নিতে তার মোটেই কষ্ট হবে না। নিয়ে একেবারে তুলবে আমাদের বাড়ি নয়, নার্সদের কোয়ার্টারে। আমার চিঠি পেলেই নিখিল সব ব্যবস্থা করে রেখে দেবে। যদি ইচ্ছে করিস ওখানে থেকে নার্সিং শিখে চাকরি করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবি।

অচলা চুপ করে আছে দেখে ইতি ঠাট্টা করে বললে,—কি রে, ঘাবড়ে গেলি না কি ? শুধু তোর মনের বল আর সাহসের ওপর সব কিছু নির্ভর করছে। অন্য দিকটাও ভেবে দেখো। বদনামে দেশ ছেয়ে যাবে। ওরা তোকে খুঁজে বার করতেও চেষ্টার ত্রুটি করবে না। কিন্তু সাবধান সই, ঘুণাক্ষরেও যদি প্রকাশ হয় যে এর পিছনে আমি আছি—তাহলে সর্ব্বনাশ হবে। আমার জন্যে ভাবিনে—ভাবছি বাবার কথা।

সেদিন কথা বলে কৃতজ্ঞতা জানাতে পারেনি অচলা—গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোয় নি, চোখ ভরে উঠেছিল জলে—শুধু দু'হাত দিয়ে ইতির হাত দুটো চেপে সবলে ধরেছিল বুকের ওপর।······

বিকট আর্তনাদ করে গতিবেগ কমিয়ে দিল লৌহদানব। সম্বিৎ ফিরে পেয়ে সোজা হয়ে বসল অচলা। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখল দূরে অস্পষ্ট আলোর আভাস, ষ্টেশন খুব কাছেই। চুলগুলো ভিজে সপ-সপ করছে, চোখে-মুখে জল। শাড়ীর আঁচল দিয়ে মুছে ভিতরে চাইল অচলা। হিন্দুস্থানী না দেহাতি স্ত্রীলোক দুটি সরু বেঞ্চিখানায় জড়সড় হয়ে শুয়ে অকাতরে ঘুমোচ্ছে। মুখের ঘোমটা সরে গেছে। দু'টিই প্রায় সমবয়সী। সুন্দর মুখখানা উল্কিতে বিশ্রী দেখাচ্ছে, কপালে থুতনিতে নাকে রুচিহীন ব্লুব্ল্যাক উল্কির ছাপ। পূর্ব অভিজ্ঞতা স্মরণ করে শক্ত করে দুহাতে বেঞ্চির দু'পাশ চেপে ধরে প্রস্তুত হয়ে বসল অচলা। একটু পরেই ট্রেন এসে থামল, একটা প্রচণ্ড ধাক্কায় ট্রেনশুদ্ধ যাত্রীকে সচকিত করে আবার ঝিমিয়ে পড়ল। জনবিরল ষ্টেশন। নামতে বা উঠতে বড় একটা দেখা গেল না কাউকে। শুধু প্রকাণ্ড একটা ছাতা মাথায় রেলের ছাপ-মারা কালো কোট গায়ে একটা লোক প্লাটফরমের এধার থেকে ওধার হেঁকে বেড়াতে লাগল 'মহুয়া মিলন'। ভারি মিষ্টি নাম তো! অচলার মনে হল শর্বরীদের ষ্টেশনটা ওরকম দাঁতভাঙা ডালটনগঞ্জ না হয়ে যদি মহুয়া মিলন হত, বেশ হতো তাহলে। বেশ জোরে বৃষ্টি এল। হিন্দুস্থানী মেয়ে দু'টি জানালা বন্ধ করে মুখোমুখী বসে গল্প শুরু করল আবার। খোলা জানালায় মুখ বার করে চোখ বুজে বসল অচলা।···

সে দিনও ছিল ঠিক এমনি বর্ষণমুখর দুর্য্যোগের রাত। অন্ধকার গাঁয়ের পথ বেয়ে একা পাঁচ মাইল হেঁটে ষ্টেশনে এসে গাড়িতে উঠল অচলা। কাপড়-চোপড় ভিজে গায়ে লেপ্টে গেছে আর দ্বিতীয় বস্ত্র নেই। জেনানা-গাড়ীতে অধিকাংশ মেয়েই ঘুমিয়ে, দু'এক জন যারা জেগে ছিল গভীর বিস্ময়ে হাঁ করে তাকিয়ে দেখছিল অচলাকে। বেলা এগারটায় গাড়ি এসে পৌঁছল শিয়ালদা ষ্টেশনে। কামরার সামনে এসে দাঁড়াল নিখিল। সুন্দর সুগঠিত যুবা। একে একে সব মেয়েরা নেমে গেল – অচলা তবুও বসে রইল গাড়িতে। কেমন একটা সঙ্কোচ ও কুণ্ঠা এসে সারা দেহ আচ্ছন্ন করে দিল অচলার।

—আপনিই তো অচলা দেবী ? মৃদু সপ্রতিভ প্রশ্ন করে নিখিল।

ঘাড় নেড়ে অচলা জানায়—হ্যাঁ।

—আমি নিখিল, বৌদির কাছে নিশ্চয়ই আমার কথা শুনেছেন। আপনি নির্ভয়ে আর নিঃসঙ্কোচে আমার সঙ্গে আসতে পারেন। সব ব্যবস্থা করে রেখেছি আমি।

এক অজানা পরিবেশে নতুন জীবনের শুরু এইখান থেকেই।

বয়স্থা মেট্রণ, রাণী ভিক্টোরিয়ার মত দেখতে অনেকটা। দেখলেই ভক্তি হয়, মা বলে ডাকতে ইচ্ছে করে। প্রথম দর্শনেই বুকে টেনে নিলেন অচলাকে, বললেন,—সব আমি শুনেছি মা, ঠিক করেছ, এই তো চাই। মেয়ে হয়ে জন্মেছ বলে সমাজের অন্যায় অত্যাচারগুলো মুখ বুজে সইতে হবে এর কোনও মানে হয় না। সারজীবন তিলে তিলে দগ্ধ হয়ে না মরে যে পথ আজ তুমি বেছে নিয়েছ—এর চেয়ে ভাল পথ মেয়েদের জীবনে আর হতে পারে না। মানুষের সেবা, দেশের ও দশের কল্যাণে নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দেওয়া, এই হল এর মূলমন্ত্র। শত্রু-মিত্র নির্ব্বিচারে নিজের কর্ত্তব্য অবিচলিত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে যাওয়া—খুব শক্ত হলেও অসম্ভব নয়। তোমাকে দেখে মনে হয় তুমি পারবে। ফ্লোরেন্স নাইটিংগেলের নাম শুনেছ ?

অচলা মাথা নেড়ে অজ্ঞতা জানায়।

মেট্রণ বললেন—আর এক দিন তোমাকে সেই মহীয়সী নারীর পুণ্য জীবনকথা শোনাব।

এর পর একটা বছর কি ভাবে কোন্ দিক দিয়ে কেটে গেল ভাল মনে পড়ে না অচলার। শুধু মনে আছে নিখিলের অক্লান্ত চেষ্টা ও সহযোগিতা, মেট্রণের অদম্য উৎসাহ অনুপ্রেরণা আর নিজের ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও সাধনায় এক দিন শুনল সে ভাল ভাবেই পরীক্ষায় পাশ করে মেডিকেল কলেজেই চাকরী পেয়ে গেছে। শুধু নার্সিংই শেখেনি অচলা—কাজ চালিয়ে নেবার মত মোটামুটি ইংরাজী-বাংলাও শিখে নিয়েছে নিখিলের অদ্ভুত শিক্ষকতা গুণে।

মামা অতুল বাবু এক দিন মেডিকেল কলেজে এসে হাজীর। অচলা তখন ডিউটিতে। অন্য একটি নার্স এসে জানালে—অচলাদি', দেশ থেকে তোমার মামা এসেছেন, দেখা করতে চান।

প্রথমটা নার্ভাস হয়ে গিয়েছিল অচলা। একটু পরেই সামলে নিয়ে বললে—বললি না কেন, এখন আমি ডিউটিতে, দেখা হবে না।

—বলেছিলাম। বললেন, বিশেষ দরকার, দেখা না করলেই নয়। আমি তোমার হয়ে ডিউটি করছি, তুমি পাঁচ মিনিটের জন্যে ঘুরে এস না অচলাদি'।

নীচে ভিজিটার্স রুমে ঢুকতেই অতুল বাবু গর্জন করে উঠলেন,—কাপড়-চোপড় ছেড়ে এখুনি তোমাকে আমার সঙ্গে দেশে রওনা হতে হবে।

বেশ ধীর স্থির কণ্ঠে অচলা বললে,—প্রথম কথা—এটা আপনার গাঁয়ের নিজের বাড়ী নয়, অত চেঁচিয়ে কথা না বললেও আমি শুনতে পাব। দ্বিতীয় কথা—গায়ের জোরে আমাকে টেনে নিয়ে যাবার বয়েস আমি পার হয়ে এসেছি—সেদিক দিয়েও কোন সুবিধে হবে না। আর একটা কথা না জিজ্ঞাসা করে পারছি না—কুমারী মেয়ে গৃহত্যাগ করে এলে, বছরখানেক বাদে তাকে আবার ফিরিয়ে নেবার নতুন বিধান কবে থেকে আপনাদের সমাজে চালু হয়েছে মামা ?

ব্যর্থ রোষে নিজের মনে গজগজ করতে করতে বেরিয়ে গিয়েছিলেন অতুল বাবু, আর আসেন নি।

কর্ম্মময় স্বাধীন জীবন, বেশ লাগছিল অচলার। সময় পেলেই ইতিদের বাড়ি গিয়ে গল্প জমিয়ে তোলা। কোনও দিন সিনেমা, কোনও দিন গড়ের মাঠে হাওয়া খাওয়া,—অধিকাংশ দিন ইতিদের ওখান থেকেই ভোজনপর্ব শেষ করে হোষ্টেলে ফেরা—অচলার জীবনে সে এক অবিস্মরণীয় মধুর অভিজ্ঞতা !

ইতির স্বামী অরবিন্দর সঙ্গে বিয়ের সময় গাঁয়েই আলাপ হয়েছিল, নিবিড় ও সহজ হয়ে উঠল এখানে এসে। চমৎকার নিরহঙ্কার মানুষটি। ইতির বাড়িতে আসার আরও একটি বিশেষ কারণ ছিল

অচলার। নিখিলকে দেখা, ওর সঙ্গে গল্প করা—যতটুকু সময় হোক, ওর সান্নিধ্য কামনা করত অচলা, সমস্ত দেহ-মন দিয়ে। আর কেউ বুঝতে না পারলেও, কিছুটা আন্দাজ করে নিয়েছিল ইতি। সেদিন দুপুরে একা বসে একখানা মাসিকের পাতা ওল্‌টাচ্ছিল ইতি। অরবিন্দ আফিসে। নিখিল এক দিনের ছুটিতে বন্ধু-বান্ধব নিয়ে কলকাতার বাইরে গেছে পিক্‌নিক্ করতে। অচলা এসে হাজির। ইতি জানতো, এ হপ্তা অচলার ডে-ডিউটি। তাই একটু অবাক হয়ে বললে,—তুই হঠাৎ এ সময়ে?

—কেন, তোর বাড়িতেও কি হাসপাতালের মত রুটিনবাঁধা টাইমে দেখা করতে হবে?

—তা নয়। বলছিলাম, ডিউটি রয়েছে—এলি কি বলে?

—বড্ড মাথা ধরেছে বলে ছুটি নিয়ে এলাম তোর সঙ্গে গল্প করতে।

—উঁহু, কেন এসেছিস আমি জানি, বলব?

—বলো না শুনি, দৈবজ্ঞ ঠাকুর!

—ঠাকুরপোর খবর নিতে। আজ হাসপাতালে দেখতে পাসনি, তাই ভেবেছিস হয়তো কোনও অসুখ-বিসুখ করেছে, কেমন ঠিক বলিনি?

কপট রাগে অচলা বলে—ফের যদি ঐ সব ঠাট্টা করবি তুই তাহলে তোদের বাড়ি আসাই বন্ধ করে দেব।

হেসে ইতি বলে,—ইস্ বন্ধ করাটা অত সহজ কি না! আমি জানি তোকে বারণ করলেও ছল-ছুতোয় তুই আসবিই। কথায় আছে দুর্জনের ছলের অভাব হয় না।

হেসে ফেলে অচলা বলে,—বটে, আমি দুর্জন, কিসে হলাম শুনি?

পরম বিজ্ঞের ভঙ্গিতে সোজা হয়ে বসে গম্ভীর ভাবে বলে ইতি—তবে মন দিয়ে শোন বৎস! প্রথমতঃ মামা-মামী—যাঁরা এতটুকু বেলা থেকে তোমাকে পুত্রাধিক স্নেহে খাইয়ে-পরিয়ে মানুষ করে এত বড়টি করেছেন, তাঁদের অত বড় আশায় তুমি ছাই নিক্ষেপ করে

এসেছ। দ্বিতীয়—নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ দাশু ঘটক, তাঁর বার্দ্ধক্যের সাধের তাজমহল তুমি নির্ম্মম ফুঁয়ে তাসের ঘরের মত নিমেষে ধূলিসাৎ করে এসেছ। তৃতীয় এবং সবচেয়ে মারাত্মক কারণ হল—ভদ্রঘরের সুন্দরী যুবতী নারী হয়ে তুমি অনায়াসে টারজন দি ফেয়ারলেসের মত এক বস্ত্রে দুর্য্যোগ রাতে একা দীর্ঘ বিপদসঙ্কুল পথ অতিক্রম করে ট্রেনে উঠে বসলে। দুর্জনের আর কি কোয়ালিফিকেসন দরকার, আমার জানা নেই।

—ব্রেভো! ওয়েল সেড্ ইতি। হাততালি দিয়ে হাসতে হাসতে ঘরে ঢোকে অরবিন্দ।

ইতি বললে—দরজার বাইরে থেকে আড়ি পেতে আমাদের কথা শুনছিলে বুঝি?

—সব কথা শোনবার সৌভাগ্য হয়নি—শুধু দুর্জনের ডেফিনেশনটা সব শুনে ফেলেছি। কি করি বল, অমন সরস আলোচনাটার মাঝখানে ঢুকে পড়ে রসভঙ্গ করতে ইচ্ছে হল না— তাই।

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে ইতি বলে—তুমিও কি বড্ড মাথা ধরেছে বলে আফিস থেকে ছুটি নিয়ে এলে?

অবাক হয়ে অরবিন্দ বলে—মাথা? কই না, মাথা ধরেনি তো। বেশ লোক তুমি, কাল অত করে বলে দিলে সকাল সকাল ছুটি নিয়ে বাড়ি আসতে, টালিগঞ্জে মামীমার বাড়ি যাবে, সব ভুলে বসে আছ?

ভারি লজ্জা পায় ইতি! উঠে পড়ে বলে—তোমরা দু'জনে গল্প কর, আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে তৈরি হয়ে আসছি। অচি, পালাস নি কিন্তু, আজ তোকে মামীমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব—দেখবি কি চমৎকার লোক!

তারপর তিনজনে হৈ হৈ করে ট্যাক্সি চেপে টালিগঞ্জে যাওয়া।

রিচুঘুটা। মাথায় কে যেন লাঠি মারল অচলার। কি বিদঘুটে নাম রে বাবা! অদ্ভুত লাইন। মহুয়া-মিলনের পাশে রিচুঘুটা—চমৎকার মিল। মনে মনে দু'-তিনবার আউড়ে গেল নাম দুটো অচলা। পাশের কামরায় কি একটা গণ্ডগোল শোনা গেল। ব্যাপার

কি দেখবার জন্য উঠতে গিয়েই যন্ত্রণায় অস্ফুট আর্ত্তনাদ করে ঝুপ করে বসে পড়ল অচলা। এক ভাবে অনেকক্ষণ বসে থেকে থেকে হাত-পা ভেরে গেছে; শিরাগুলো ব্যথায় টনটন করছে। নড়ে-চড়ে হাত বুলিয়ে যন্ত্রনা একটু কমলে আস্তে আস্তে বেঞ্চির হাতল ধরে দরজায় গিয়ে বাইরে মুখ বাড়িয়ে দাঁড়াল অচলা।

ছ'-তিনটে দেহাতি কুলি গোছের লোককে পাকড়ও করে সদর্পে ষ্টেশন ঘর মুখো চলেছে টিকিট-চেকার, এক সঙ্গে হাঁউ-মাঁউ করে তিন জনে কি বলতে চাইছে যেন—সেদিকে কর্ণপাত না করে চেকার সাহেব জোরে পা চালিয়ে দিলেন। অনুমানে ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে ভিতরে এসে আস্তে আস্তে পায়চারি করতে লাগল অচলা। আর কিছু না হোক রিচুঘুটায় অন্ততঃ মানুষের সাড়া-শব্দ পাওয়া গেল, এও একটা সান্ত্বনা। হাত-ঘড়িটা দেখল অচলা—রাত ঠিক ছটো। এখনও প্রায় ঘণ্টা তিনেকের জার্নি। বেঞ্চিটায় বসে সুটকেশটা মাথায় দিয়ে সটান শুয়ে পড়ল অচলা।

আজ যেন অজানা অনিশ্চিত ভবিষ্যতের চেয়ে ব্যথাভরা অতীতের আকর্ষণই বেশী। চেষ্টা করেও থামতে পারে না অচলা, চুম্বকের মত পিছু টানতে থাকে।···

নাইট ডিউটিটাই বেশি পছন্দ করে অচলা। ভিজিটারের ভিড় নেই, বাইরে হৈ-হল্লা নেই, বেশ নিরিবিলিতে চুপ-চাপ কাজ করে যাওয়া। তার উপর যদি নিখিলেরও নাইট-ডিউটি থাকে তাহলে সোনায় সোহাগা। নিখিল বিশেষ করে বলে দিয়েছে—রোগীর অবস্থা একটু এদিক-সেদিক দেখলে তখনি কোনও দ্বিধা না করে তাকে যেন ডেকে পাঠানো হয়।

সেদিনের কথা আজও স্পষ্ট মনে আছে অচলার। নাইট ডিউটি করছে, রাত তখন প্রায় একটা, হঠাৎ দেখলো আট নম্বর বেডের রুগী কেমন ছটফট করছে ও ভুল বকছে। নিখিলেরও ডিউটি ছিল তখন। ব্যস্ত হয়ে নিখিলের খোঁজে গিয়ে দেখে ডক্টরস রুমে চেয়ারের হাতলের ওপর মাথা রেখে অকাতরে ঘুমোচ্ছে নিখিল। ছ'-বার ডেকে সাড়া

না পেয়ে কাছে গিয়ে হাত ধরে একটু নাড়া দিতেই নিখিল ধড়মড় করে উঠে পড়ল। তাড়াতাড়ি হলে এসে রুগী দেখে হেসে বলেছিল নিখিল,—এতেই এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন অচলা দেবী? কিছুই নয়—জ্বরটা খুব বেড়েছে বলে ভুল বকছে। মাথায় আইস-ব্যাগ দিন আর টেম্পারেচার কমলে মিক্সাচারটা এক দাগ খাইয়ে দিন—দেখবেন শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়বে।

দু'জন নার্স ছুটি নিয়েছে, ভাগাভাগি করে ডিউটি করতে হচ্ছে। দু'-দিন ইতিদের বাড়ি যেতে পারেনি অচলা, নিখিলও দু-তিন দিন হাসপাতালে আসে না। অন্য ডাক্তারদের জিজ্ঞাসা করতেও লজ্জা করে। সেদিন পাঁচটার ডিউটি শেষ হবার আধ-ঘণ্টা আগেই হেড-নার্সকে বলে ছুটি নিয়ে বেরিয়ে পড়লো অচলা। আমহার্ষ্ট স্ট্রীটে ইতিদের বাড়ি। একখানা রিক্সা চেপে সোজা গিয়ে উঠল ওদের বাড়ি। বাইরের দরজা খোলা। সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে চোরের মত সন্তর্পণে ডান দিকে নিখিলের ঘরে উঁকি দিয়ে দেখল—কেউ নেই। বারান্দার শেষপ্রান্তে পূবদিকে ইতির শোবার ঘর। দরজার বাইরে থেকে দেখল আপাদ-মস্তক লেপ ঢাকা দিয়ে শীতের বিকেল বেলা অকাতরে ঘুমুচ্ছে ইতি। নিঃশব্দে জুতোটা বাইরে খুলে পা টিপে টিপে এগিয়ে চলল অচলা খাটের কাছে। একটা দুষ্টু হাসি ফুটে উঠল ওর চোখে-মুখে। তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ওকে জাপটে ধরে বললে অচলা, তবে রে মিথ্যেবাদী, দুপুরে তুমি না ঘুমিয়ে বই পড়ে কাটাও? এদিকে বলা হয় রাতে ভাল ঘুম হয় না—ক্ষিদে…

মুখ থেকে লেপটা সরিয়ে পাশ ফিরে হো-হো করে হেসে উঠল অরবিন্দ, বললে—ভাগ্যিস আজ শরীরটা ভাল নেই বলে আফিস কামাই করেছিলাম, তাইতো মেঘ না চাইতে জল!

লেপের ভেতর থেকে হাত বার করে জড়িয়ে ধরে অরবিন্দ। লজ্জায় চোখ মুখ লাল হয়ে ওঠে অচলার। প্রাণপণে আলিঙ্গন-মুক্ত হতে চেষ্টা করে, পারে না। কোনও রকমে বলে—ছিঃ ছিঃ, ইতি…

—ইতি তিনটের শোতে নিখিলকে নিয়ে সিনেমায় গেছে—ফেরবার

সময়ও হয়ে এসেছে। কিন্তু অত লজ্জা কিসের? স্ত্রীর অন্তরঙ্গ বান্ধবী, তার সঙ্গে এটুকু স্বাধীনতা এযুগে নিন্দনীয় নয়।

আওয়াজ পেয়ে দুজনেই ফিরে তাকায়—দেখে দরজার সামনে বাইরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে ইতি আর নিখিল।

আলিঙ্গনের বাঁধন শিথিল হয়ে পড়ে, হাত সরিয়ে নেয় অরবিন্দ। আস্তে আস্তে খাট থেকে নেমে ইতির সামনে এসে দাঁড়ায় অচলা। দেখে—ক্রোধ ঘৃণা থেকে সুরু করে সব-কটা উগ্র রিপু এক সঙ্গে মিশে ইতির সুন্দর মুখখানা বিকৃত বীভৎস করে তুলেছে।

ইতি বললে—সেদিন পুকুর-ঘাটে হাত ধরে যখন কেঁদেছিলি—তখন তোকে বিষ দেওয়াই আমার উচিত ছিল। উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করে পাশ কাটিয়ে ঘরে ঢুকে পড়ল ইতি। নিরুপায়ের মত শেষ আশ্রয় খোঁজে অচলা, নিখিলের মুখের দিকে চেয়ে। দেখে সেখানেও পরিষ্কার ফুটে উঠেছে বিজাতীয় ঘৃণা ও অবজ্ঞা, একবার চেয়েই মুখ ফিরিয়ে নেয় নিখিল। কোনও কথা না বলে নিঃশব্দে বেরিয়ে এল অচলা ইতিদের বাড়ী থেকে।

ইতিদের সঙ্গে এইখানেই ইতি।

সোজা হোষ্টেলে গিয়ে শুয়ে পড়ল অচলা। হোষ্টেল ফাঁকা, অন্য নার্সরা কেউ ডিউটিতে, কেউ সিনেমায়, কেউ বা বেড়াতে বাইরে গেছে। নিঃশব্দে কাঁদছিল অচলা। মেট্রণ এসে কাছে বসে মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে জিজ্ঞাসা করলেন,—কি হয়েছে মা অচলা?

ভেবেছিল, এ চরম লজ্জার কথা আর কারও কাছে বলবে না—কিন্তু পারল না - একে একে সব কথাই বলে গেল অচলা। শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মেট্রণ বললেন,—সত্যি তোমার জন্যে দুঃখু হয় মা! এ ব্যাপারে আমি কি করতে পারি মা?

—আমাকে এখনই একটা ভাল হোষ্টেল ঠিক করে দিতে হবে মা, ওদের এত কাছে থাকা এরপর আর চলে না।

হ্যারিসন রোডের ওপরেই একটা নার্সিংহোম—মেট্রণের জানা, ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই মেট্রণের চিঠি নিয়ে চলে গেল অচলা।

আলাদা কোন রুম খালি নেই—আর একটি মেয়ের সঙ্গে থাকতে হবে। অগত্যা তাতেই রাজী। প্রথম দর্শনেই মেয়েটিকে ভাল লাগল অচলার। সব সময় হাসিখুশী—ওরই সমবয়সী। অল্প সময়ের মধ্যেই বেশ ভাব হয়ে গেল ছু'জনের।

মেয়েটি বললে,—সত্যি একা একা ভাল লাগছিল না আমার অচলাদি, কিছু না হোক ছু'জনে গল্প করেও সময় কাটিয়ে দিতে পারবো।

এই হল শর্বরী।

জানালার কাছে ছু'জন হিন্দুস্থানী চেঁচামেচি শুরু করে দিল। ধড়মড় করে উঠে বসল অচলা। বাইরে চেয়ে দেখে চিপাদোহার ষ্টেশনে গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে। প্লাটফরমে দাঁড়িয়ে চেঁচামেচি করে মেয়ে ছু'টির ঘুম ভাঙাচ্ছে বোধ হয় ওদেরই আত্মীয়। তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে বোঁচকা বুঁচকি নিয়ে ভারি দেড়মণি রূপোর মলের আওয়াজ করতে করতে নেমে গেল মেয়ে ছু'টো। গাড়ি একদম খালি। উঠে দরজা বন্ধ করে বাথরুমে গিয়ে চোখে-মুখে জল দিয়ে বেঞ্চিটায় পা ছড়িয়ে কামরার তক্তার পার্টিসনে হেলান দিয়ে বসল অচলা।

শেষ-হয়ে-যাওয়া ইতিহাসে নতুন পাতা জুড়ে লেখা শুরু হল আবার······

ছু'মাসের ওপর চলে এসেছে অচলা নার্সিংহোমে। ছোট্ট হোষ্টেল। সবশুদ্ধ সাতটি মেয়ে থাকে। সবাই নার্সিং পাশ করে প্রাইভেট প্র্যাক্‌টিস করে—অচলাই শুধু হাসপাতালে নিয়মিত ডিউটি দেয়। অনেক সময় কলে বাইরে গিয়ে ছু'-তিন দিন কাটিয়ে আসতে হয়,—শর্বরীও মাঝে-মধ্যে যায়। সেই সময়টা অচলার ভারি বিশ্রী লাগে, সময় যেন আর কাটতে চায় না। হাসপাতালেও সব সময় সন্ত্রস্ত হয়ে থাকতে হয়—চেষ্টা করে নিখিলের সান্নিধ্য এড়িয়ে চলে। দৈবাৎ সামনা-সামনি পড়ে গেলে ছু'জনেই মুখ ফিরিয়ে চলে যায়—কথা হয় না।

এই অল্প দিনের মধ্যে শর্বরীর সঙ্গে অন্তরঙ্গতা বেড়ে গেছে অনেকখানি। অচলার বেদনাময় অতীত সবটা না হলেও অনেকখানি জেনে গেছে শর্বরী। শর্বরীর ইতিহাস অতটা ব্যাপক না হলেও কিছুটা ব্যথা ও হতাশায় ভরা। ব্যাপারটা মোটামুটি এই।

ম্যাট্রিক পাশ করার পর ভালবাসল শর্বরী পাড়ার একটি ছেলেকে। সে-ও মেসে থেকে বি-এ. পড়ত। বাড়ির অবস্থা ভাল। বাপ রিটায়ার্ড রেলওয়ে অফিসার। বিহারে বাড়ি, জায়গা-জমি সব আছে। অল্পদিনের মধ্যে আলাপ ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হতেই ছেলেটি শর্বরীকে বিয়ের প্রস্তাব করে বসল। শর্বরীও সানন্দে সম্মতি দিল, বেঁকে বসলেন শর্বরীর বাবা। অসবর্ণ বিয়েতে তিনি কিছুতেই সম্মতি দিলেন না। শর্বরীরা ব্রাহ্মণ, ছেলেটি কায়স্থ। এই ব্যাপার নিয়ে সাংসারিক অশান্তি যখন চরমে উঠেছে, সেই সময় একদিন আফিস থেকে ফেরবার পথে গাড়ী চাপা পড়ে শর্বরীর বাবা মারা গেলেন। চারদিক অন্ধকার দেখলো শর্বরী। সংসারে তিন-চারটি ছোট ভাই-বোন, মা, চলবে কি করে !

লজ্জা-সঙ্কোচ পরিত্যাগ করে ছুটে গেল শর্বরী মেসে ছেলেটির খোঁজে। সেখানে শুনল, দিন সাতেক আগে শর্বরীর বাবা মেসে এসে যাচ্ছেতাই অপমান করে যাবার পরদিনই ছেলেটি মেস ছেড়ে চলে গেছে। কোথায় গেছে কেউ জানে না। দিশেহারা হয়ে পড়ল শর্বরী। বাবার প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের হাজার তিনেক আর পোষ্ট আফিসের কয়েক শ' টাকা মাত্র সম্বল। এ দিয়ে ক'দিন চলবে ? শর্বরীর এক দূর সম্পর্কের বিধবা পিসি নার্সের কাজ করেন। হঠাৎ একদিন রাস্তায় তাঁর সঙ্গে দেখা। তাঁরই পরামর্শে নার্সিং পাশ করে যা হোক করে দাঁড়িয়েছে শর্বরী। তবে বিয়ে আর জীবনে করবে না এটা স্থির নিশ্চয়।

দু'দিনের জন্যে আসানসোল চলে গেছে শর্বরী। হাসপাতাল থেকে ফিরে শূন্য ঘরে মন টেকে না অচলার। একখানা বই নিয়ে শুয়ে পড়ে আনমনে পাতা ওল্টাতে থাকে। ভেজান দরজাটা সশব্দে খুলে

হুড়-মুড় করে ঝড়ের মত ঘরে ঢুকে জড়িয়ে ধরলো শর্বরী অচলাকে।

অচলা বলে,—ব্যাপার কি? হঠাৎ এত উচ্ছ্বাসের কি কারণ ঘটল?

অচলার বুকে মুখ লুকিয়ে শর্বরী বলে, পেয়েছি অচলাদি'।

—কী পেয়েছিস?

—তার দেখা।

—কার?

হাসিমুখে তাকায় শর্বরী অচলার দিকে। তার পর ঝুঁকে পড়ে কানের কাছে মুখ নিয়ে চুপি চুপি বলে, আমার হারানো বরের সঙ্গে দেখা হয়েছে আজ।

খুশীতে ও উত্তেজনায় উঠে বসে অচলা। শর্বরীকে জড়িয়ে ধরে বলে, সব কথা আমায় খুলে বল দুষ্টু মেয়ে! উৎসাহে গড় গড় করে বলে যায় শর্বরী, আসানসোল ষ্টেশনে নেমে পেসেণ্টের বাড়ি গিয়ে শুনি মেয়েটি ভোরবেলায় মারা গেছে। ওরা আমায় দু' দিনের ফি আর গাড়ি ভাড়া দিতে চেয়েছিল, আমি শুধু গাড়ী ভাড়া ছাড়া আর কিছুই নিইনি। ষ্টেশনে এসে দেখি কলকাতার গাড়ি ঘণ্টা দেড়েক পরে। কি করি ওয়েটিং-রুমে ঢুকে দেখি—একটা বেতের ইজিচেয়ারে শুয়ে দিব্যি নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে। কাছে গিয়ে একবার ডাকতেই লাফিয়ে উঠল। তারপর কথা আর শেষ হয় না আমাদের।

অসহিষ্ণু হয়ে অচলা বলে, কী কথা? এতদিন কোথায় ছিল, খোঁজ নেয়নি কেন, জিজ্ঞেস করেছিলি?

—সব। দাঁড়াও বলছি, একটু দম নিতে দাও।

টেবিলের উপররাখা মাটির কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে ঢক ঢক করে এক নিঃশ্বাসে এক গ্লাস জল খেয়ে খাটের পাশে বসে বললে শর্বরী, মেস ছেড়ে দিয়ে এক বন্ধুর বাড়িতে থেকে বি-এ, পরীক্ষা দিল, পাশ করল। ওর এক কাকা অর্ডার সাপ্লাইয়ের কাজ করতেন। তাঁর কথা মত আর না পড়ে সোজা চলে গেল বর্মা। বছরখানেক বাদে ফিরে আমাকে অনেক খুঁজেছিল, পায়নি। আর পাবেই বা কি করে,

বাবা মারা যাবার একমাস বাদেই আমরা ও বাড়ি ছেড়ে অন্য পাড়ায় উঠে গিয়েছিলাম। তার পর থেকে অর্ডার সাপ্লাই-এর কাজে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ায়। পয়সা-কড়িও বেশ করেছে। দিন কুড়ি হল রেঙ্গুন থেকে ফিরেছে।

—আর আসল কথাটা? বিয়ে করেছে কি না তা তো বললি না?

লজ্জায় লাল হয়ে উঠে শর্বরী। মুখ নীচু করে বলে, না। এই শনিবারে কাশীতে আমাদের বিয়ে অচলাদি'। আজ রাতের গাড়িতে আমরা বেনারস চলে যাব।

একটু অবাক হয়ে অচলা বলে, কলকাতা ছেড়ে কাশীতে কেন?

—ওখানে আমার এক বিধবা পিসিমার কাছে মা, ভাই-বোনেরা রয়েছে। বিয়ের পর সোজা চলে যাব ডালটন্‌গঞ্জে ওদের বাড়িতে।

অভাগা যেদিকে চায় সাগর শুকায়ে যায়। কলকাতায় অচলার একমাত্র দরদী বন্ধু অবলম্বন ছিল শর্বরী—সেও শেষে বিদায় নিয়ে চললো।

যাবার সময় বারবার করে বলে গেল শর্বরী, চিঠি দিলে উত্তর দিও দিদি। ছোট বোনটাকে একবারে পর করে দিও না যেন।

কলকাতা অসহ্য হয়ে উঠল অচলার। একদিন রাত্রে মেট্রণের কাছে গিয়ে কেঁদে পড়ল অচলা,—মা গো—কলকাতার বাইরে, যে কোন জায়গায় আমাকে একটা চাকরী ঠিক করে দাও—যত দূরে হয় তত ভাল।

দিন সাতেক বাদে একদিন মেট্রণ ডেকে পাঠালেন অচলাকে। বললেন,—রাঁচি থেকে একটা জরুরী চিঠি এসেছে আমার কাছে। ওরা একজন এফিসিয়েন্ট নার্স চায় ওখানকার হাসপাতালের জন্যে। মাইনেও বেশী—তাছাড়া ফ্রি কোয়াটার্স। সত্যি কলকাতা ছেড়ে যেতে পারবে তুমি?

—এখুনি।

মুক্তির আনন্দে কেঁদে ফেললে অচলা।

দু'দিন বাদে মৈত্রেণের চিঠি নিয়ে রাঁচি চলে এল।

নিয়মিত চিঠি দেয় শর্বরী। অচলাও উত্তর দেয়। প্রায় সব চিঠিতেই লেখে শর্বরী—দিদি, ডাল্টনগঞ্জ বড্ড ফাঁকা, এদের দেহাতি ভাষা বুঝতে পারি না, কথা কইবারও লোক নেই। উনি প্রায়ই কাজ নিয়ে বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়ান। এ যেন সোনার খাঁচায় বন্দী হয়ে আছি। সব সময় তোমার কথা মনে হয়, একবার যদি এখানে আসতে। কিন্তু আমার তেমন ভাগ্য কি হবে?

সেদিন হাসি পেয়েছিল অচলার। বোকা মেয়েটা তো জানে না যে অচলাকে দেখলে ভাগ্য দেশ ছেড়ে পালায়!

রাঁচি আসবার আগের দিন শর্বরীকে চিঠি লিখে জানিয়েছিল অচলা। আসার পর ক্রমাগত তাগিদ।—অচলাদি', মেঘ না চাইতেই জল। এত কাছে এসে পড়েছ যখন—দু'দিনের জন্যও একবার আসতে হবে ছোট বোনের বাড়িতে।

নতুন চাকরী, এসেই ছুটি চাওয়া ভাল দেখায় না—নানা রকম যুক্তি দিয়ে দু'মাস কাটিয়ে দিল অচলা। কিন্তু আর চলে না। শর্বরী লিখল—দিদি, মাত্র কয়েক ঘণ্টার' জার্নি। তাছাড়া ওকে তোমার সব কথা বলেছি। উনিও খুব উৎসুক তোমায় দেখবার জন্য। বললেন—আসতে লিখে দাও। এই সব মেয়েই বাংলা দেশের গৌরব। এদের আদর্শে অন্য মেয়েরা অনুপ্রাণিত হয়ে পথ খুঁজে নিতে পারবে। আরও সব বড় বড় কথা। লক্ষ্মীটি অচলাদি', তোমার দুটি পায়ে পড়ি, একবার এস।

গাড়ী এসে থামল ডাল্টনগঞ্জ ষ্টেশনে। এ অঞ্চলের মধ্যে বেশ বড় ষ্টেশন। হাতঘড়িটায় রাত চারটে। স্যুটকেশটা হাতে নিয়ে নেমে পড়ল অচলা। সব শুদ্ধ পাঁচ-ছটি লোক নামলো। বেশির ভাগই রেলের কুলি পয়েণ্টসম্যান আর তাদের ফ্যামিলি।

বৃষ্টি থেমে গেলেও মেঘ কাটেনি। ষ্টেশনের বাইরে কোনও গাড়ি, রিক্সা কিছু নেই, নির্জন রাস্তা খাঁ-খাঁ করছে। অজানা অচেনা জায়গা, অন্ধকার রাতে সমস্যায় পড়ল অচলা। প্লাটফরমে কিছুক্ষণ

পায়চারি করে ষ্টেশন মাষ্টারের ঘরের দিকে চলল। কোম্পানীর কালো কোট পরে চেয়ারে বসে ঝিমোচ্ছে আধাবয়েসী একটি লোক। বার কতক ডাকাডাকি করতেই চোখ মেলে তাকালো লোকটা; তারপর অচলাকে দেখে প্রকাণ্ড হাঁ করে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল।

অচলা বললে—রিটায়ার্ড রেলওয়ে অফিসার আর, সি, দত্ত'র বাড়িটা ষ্টেশন থেকে কত দূর, দয়া করে বলবেন?

একটা ঢোঁক গিলে হাঁ বন্ধ করে লোকটি বললে—দত্ত সাবকা কোঠি হিঁয়াসে পুরা দেড় মাইল। অওর কোই হ্যায় আপকা সাথ?

অচলা বললে—না।

আবার হাঁ করে চেয়ে রইল লোকটা। একটু পরে বললে, রাতমে একেলা যানা ঠিক নহি। আপ যাইয়ে ওয়েটিং-রুমমে। ফজিরমে গাড়িউড়ি সব মিলেগে। টিকিট হ্যায় আপকা?

স্যুটকেশ খুলে টিকিট বার করে দেয় অচলা। সেই ভাল, ঘণ্টা খানেক বই ত নয়। ওয়েটিং-রুমের দরজা বন্ধ, একটু ঠেলতেই খুলে গেল। ঢুকেই নাকে রুমাল দিয়ে বেরিয়ে এল অচলা। পচা ভাপসা একটা দুর্গন্ধে ঘরের আবহাওয়া বিষিয়ে রয়েছে—বমিতে পেটের নাড়ী উল্টে আসে। ওয়েটিং-রুমের আশা ত্যাগ করে প্লাটফরমে ঘুরে বেড়াতে লাগল অচলা। ছোট হলেও স্যুটকেশটা ভারি, বেশীক্ষণ হাতে নিয়ে বেড়ান যায় না। মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে ওটা হাত থেকে নামিয়ে বিশ্রাম করে নেয় অচলা।

বেঞ্চিগুলো খালি নেই। সবগুলোতে রেলের কুলী নয়তো ঐ ধরণের যাত্রীরা আপাদ মস্তক চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছে। বেরোবার গেটের বাঁ দিকে একখানা বড় বেঞ্চি বোধ হয় খালি। এগিয়ে কাছে এসে দেখে, প্রকাণ্ড এক জোয়ান হাত দুখানা মাথার নীচে দিয়ে ঘুমুচ্ছে। অচলার যেন মনে হল লোকটা জেগেই আছে, ওকে দেখেই ঘুমের ভাণ করলো। মরুকগে ছাই, এর চেয়ে হেঁটে যাওয়া ভাল। অপরিচিত জায়গা—অন্ধকার রাত, একলা—একটু দ্বিধা আসে যেন!

পরক্ষণেই মামার বাড়ী থেকে চলে আসা রাতের কথা মনে পড়ে। দৃঢ় হাতে স্যুটকেশটা উঠিয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে রাস্তায়।

ষ্টেশন থেকে ছিটকে আসছে মিটমিটে খানিকটা আলো। সামনের রাস্তাটায় ঘুটঘুটে অন্ধকার। শর্বরী লিখেছিল ষ্টেশন থেকে বেরিয়ে ডান দিকের রাস্তা যেটা বরাবব পশ্চিমমুখো চলে গেছে—সেইটে ধরে এগিয়ে গেলে রাস্তার ডান ধারেই গেটওলা বাংলো প্যাটার্ণের বাড়ি।

খোয়া বারকরা অসমতল রাস্তা। মাঝে মাঝে বড় বড় গর্ত। বহুদিন সংস্কার অভাবে এবড়ো-খেবড়ো। সাবধানে পথ চেয়ে না চললেই বিপদের সম্ভাবনা। পথ চলতে চলতে বেশ খানিকটা দমে গেল অচলা। ষ্টেশনের সীমানা পেরিয়ে পথের দুধারে কোনও বাড়ি নজরে পড়ে না—শুধু উঁচু-নীচু পাথুরে লাল মাটি ধু ধু করছে আর কয়েকটা শাল জাতীয় বড় বড় গাছ হেলে পথের ধারে এসেছে—অন্ধকার সেইখানটায় সব চেয়ে বেশি।

সন্তর্পণে পা টিপে টিপে রাস্তার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে চলেছে অচলা। কানে এল—খট-খট-খট। প্রথমে মনে করল শোনার ভুল। একটু দাঁড়িয়ে পিছনে যত দূর দৃষ্টি চলে দেখবার চেষ্টা করে অচলা। কিছুই দেখা যায় না—শুধু ধোঁয়ার মত গাঢ় অন্ধকার। আবার চলতে শুরু করে—আবার পিছনে আওয়াজ ওঠে খট-খট-খট, নিশ্চয় কেউ লালবাঁধান ভারি জুতো পায়ে পিছনে আসছে। এক অজানা ভয়ে সারা দেহ কেঁপে ওঠে অচলার। মনকে বোঝাবার চেষ্টা করে—হয়ত ওরই মত কোন নিরীহ পথিক। সন্দেহ ঘোচাতে জোরে চলতে শুরু করল অচলা—পিছনের আওয়াজও দ্রুত হয়ে ওঠে। রীতিমত ভয় পেয়ে গেল অচলা। স্যুটকেশটা শক্ত করে ধরে রাস্তার গর্ত্তে পড়ে যাবার বিপদ তুচ্ছ করে ছুটতে লাগল, আওয়াজ শুনে বুঝতে মোটেই কষ্ট হয় না—পিছনের অজ্ঞাত লোকটিও ছুটতে সুরু করেছে। হাঁপিয়ে ওঠে অচলা। দম নিতে একটুখানি থেমে দাঁড়িয়ে সভয়ে পিছনে চায়। জমাট কালো মেঘের আড়াল থেকে চাঁদ অনেক চেষ্টা করে একটু উঁকি দিলেন। সেই আবছা আলোয় দেখলো অচলা

—হাত পনেরো দূরে দাঁড়িয়ে পড়েছে ষ্টেশনের বেঞ্চে মাথার নীচে হাত দিয়ে শুয়ে থাকা সেই দশাসই হিন্দুস্থানী দৈত্যটা। দূর থেকে স্পষ্ট দেখা না গেলেও এটা বুঝতে মোটেই কষ্ট হয় না, লোকটা প্রকাণ্ড জোয়ান—যেমন লম্বা তেমনি বিশাল বুকের ছাতি। সাদা আদ্দির কলিদার পাঞ্জাবীটা হাওয়ায় লটপট করছে বুকের ওপর।

দেহের ও মনের সমস্ত শক্তি জড়ো করে স্যুটকেশ হাতে ছুটল অচলা। লোকটাও ছুটল। পিছনে না চেয়েও বেশ বুঝতে পারলো অচলা—তুজনের দূরত্ব ক্রমেই কমে আসছে। হঠাৎ পিছনে ভারি জিনিষ পড়ার আওয়াজের মতো একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদ শুনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল অচলা। মনে হল ভুমিকম্পের মত সারা রাস্তাটা যেন কেঁপে উঠল। চাঁদ ডুবে গেলেও পিছন ফিরে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অন্ধকারের আবরণ ভেদ করে দেখল অচলা, কাছেই মাত্র হাত কয়েক দূরে রাস্তার মাঝখানে মুখ থুবড়ে পড়ে যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে লোকটা। ওর পায়ের কাছে একটা বড় গর্ত্ত বৃষ্টির জলে ভরে আছে দেখে, পড়ে যাবার কারণ অনুমান করতেও কষ্ট হল না।

অচলা ভাবলে এই সুযোগ। কাতরানি শুনে মনে হয় গুরুতর আঘাত পেয়েছে লোকটা—বেশ কিছুক্ষণ বিশ্রাম না নিয়ে পিছু নেওয়া ওর পক্ষে অসম্ভব। বেশ জোরে পা চালিয়ে দিল অচলা। মেট্রণের কণ্ঠস্বর হাওয়ায় ভেসে এল—শত্রু-মিত্র নির্ব্বিচারে মানুষের সেবাই এ ব্রতের একমাত্র মূলমন্ত্র। শক্ত হলেও অসম্ভব নয়।

কয়েক পা গিয়েই দাঁড়িয়ে পড়ল অচলা। মনে হল, পা তুটো কে যেন জোর করে ধরে রেখেছে। দ্বিধা, সংশয়, ভয়—অন্যদিকে কর্ত্তব্য। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে টানা-পড়েন কাটিয়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে চলল অচলা আহত লোকটার দিকে।

কাছে এসে একটু চুপ করে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল,—কোথায় লেগেছে তোমার? কোনও উত্তর নেই। হয় অজ্ঞান হয়ে গেছে, নয়ত উত্তর দেবার বা ওঠবার সামর্থ্য নেই, শুধু একটা অস্ফুট গোঙানির আওয়াজ থেকে বোঝা গেল, লোকটা এখনও বেঁচে আছে।

মাথার কাছে রাস্তার ওপর বসে পড়ল অচলা। উপুড় হয়ে পড়েছে লোকটি, মুখ দেখা যায় না। মাথাটার ওপর আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে জিজ্ঞাসা করল অচলা,—কি কষ্ট হচ্ছে তোমার? উত্তর না দিয়ে অতি কষ্টে কনুই দুটোর ওপর ভর দিয়ে মুখ তুলে চাইল লোকটা অচলার দিকে। ভোরের নিস্তেজ মরা চাঁদ কালো মেঘের স্তরের উপরে দাঁড়িয়ে মিট্ মিট্ করে চাইছে। তারই আব্ছা আলোয় দেখা গেল, নাক-চোখ-মুখ রক্তে লাল হয়ে গেছে লোকটার। দেশী অথবা চোলাই মদের একটা বিকট দুর্গন্ধ ওর নিঃশ্বাসের সঙ্গে সমস্ত আবহাওয়াটাই বিষাক্ত করে তুলেছে।

ভিজে শাড়ির আঁচল দিয়ে যতটা পারল, মুখের রক্ত মুছে দিল অচলা। সুন্দর টক্‌টকে ফর্সা রং, বয়েস খুব বেশি হলেও একুশ-বাইশের মধ্যে। অনিয়মে অত্যাচারে দীর্ঘ টানা-টানা চোখ দুটো জবা ফুলের মত লাল, মাথার চুল পালোয়ানি ঢং-এ ছোট করে ছাঁটা, ওপরের ঠোঁটে ছোট্ট সরু গোঁফের রেখা। চোখ মুখের রক্ত পরিষ্কার করতে করতেই নজর পড়ল—কপালে ডান দিকে একটা কালো তীক্ষ্ণ পাথরের টুকরো বিঁধে আটকে রয়েছে। তা থেকে ফোঁটা ফোঁটা গাঢ় রক্ত টপ টপ করে পথের ওপর পড়ছে।

চিন্তার সময় নেই। যত্ন করে ওর মাথাটা কোলের ওপর রাখল অচলা। তার পর ক্ষিপ্র হাতে স্যুটকেসটা খুলে হাতড়াতে লাগল। অভ্যাসের বশেই হোক কিংবা ছেলেটির ভাগ্যগুণেই হোক, ছোট একটা টিনচার আইডিনের শিশি আর খানিকটা তুলো পাওয়া গেল স্যুটকেশের নীচে। বেশ খানিকটা বসে গেছে পাথরটা কপালে, আস্তে টেনে বার করা গেল না। একটু জোরে টানতেই যন্ত্রণায়, আর্ত্তনাদ করে উঠল ছেলেটা—পাথরটা বেরিয়ে এল অচলার হাতে। দেখলে ভয় হয়, বেশ খানিকটা গর্ত্ত হয়ে গেছে কপালে। ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে অচলার শাড়ির খানিকটা ভিজে গেল। নিপুণ হাতে কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে তুলোয় জবজবে করে আইডিন ঢেলে চেপে ধরল অচলা কপালের ওপর। এবার চাই ব্যাণ্ডেজ। এক

হাতে ওর কপালটা চেপে ধরে, অন্য হাতে স্যুটকেশ তন্ন তন্ন করে খুঁজেও ব্যাণ্ডেজ পাওয়া গেল না। স্যুটকেশ থেকে একটা চওড়া লাল পাড় সাদা শাড়ি থেকে খানিকটা কাপড় ছিঁড়ে নিয়ে ব্যাণ্ডেজের মত পাকিয়ে বেঁধে দিল ওর কপালে। বেশ বুঝতে পারল অচলা, অসহ্য যন্ত্রণা হলেও দাঁত মুখ চেপে সহ্য করছে ছেলেটা।

আস্তে আস্তে মাথাটা পথের ওপর নামিয়ে দিয়ে বললে,—রক্ত বন্ধ হয়ে গেছে। কিছুক্ষণ এখানে বিশ্রাম করে বাড়ি গিয়ে শুয়ে পড়। সকালে একজন ডাক্তারকে দেখিয়ে, তিনি যা বলেন, তাই করো।

শাড়িটায় নজর পড়তেই আঁতকে উঠল অচলা। রক্তে খানিকটা অংশ ভিজে জ্যাব জ্যাব করছে। এ অবস্থায় শর্বরীদের বাড়ি গেলে কি কৈফিয়ৎ দেবে অচলা? কিছু দূরে রাস্তায় একটা বড় গর্তে বৃষ্টির জল আটকে রয়েছে। তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে যতটা সম্ভব কাপড় চোপড় ধুয়ে পরিষ্কার করে নিল অচলা। ফিরে এসে স্যুটকেশটা নিয়ে যাবার আগে ছেলেটার দিকে তাকাল—দেখলে, ঠিক তেমনি ভাবে শুয়ে বিস্ফারিত চোখ দুটো দিয়ে ওরই দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে আছে ছেলেটা। মুখ ফিরিয়ে তাড়াতাড়ি চলতে সুরু করল অচলা।

কি জানি কেন, মন অনেকটা হাল্কা হয়ে গেছে অচলার। একটা খুশীর আমেজও উঁকি দিচ্ছে যেন মনের বন্ধ দরজার পাশে। অজানা, অচেনা এই শুকনো পাথুরে দেশ—বিশ্রী রাস্তা, দূরে অস্পষ্ট ধোঁয়ায় ঢাকা সারবন্দি পাহাড়গুলো, সবাই যেন নীরবে অভিনন্দন জানাচ্ছে অচলাকে।

খট্—খট্—খট্!

রীতিমত বিস্মিত হয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পিছনে তাকাল অচলা। দেখলো, টলতে টলতে ওরই দিকে এগিয়ে আসছে ছেলেটা। ভয় নয় —ঘেন্নায় সারা দেহ-মন আচ্ছন্ন হয়ে গেল অচলার। কাছে এসে দাঁড়াইতেই অচলা বললে—তুমি মানুষ? না জানোয়ার?

—জানোয়ার। বললে ছেলেটা।

—তাই দেখছি। নইলে এর পরেও আমার পিছু নিতে তুমি কখনই পারতে না।

—ঠিক বলেছিস বহেন!

বহেন? নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারে না অচলা। অবাক হয়ে বলে,—বহিনই যদি বলছ তাহলে আবার আমার পিছু নিয়েছ কেন?

—তুই আমার জান দিয়েছিস বহেন, আমার তো দিবার কিছু নাই, তাই পিছু নিয়েছি তোর জান বাঁচাতে।

বুঝতে না পেরে চুপ করে থাকে অচলা।

ছেলেটা বুঝতে পেরে বলে,—বুঝলি না? বদমাস গুণ্ডা এখানে শুধু আমি নই বহেন! আমার মত আরও দু-চারজন আছে। তারা তোকে একেলা পথে পেলে মুখ বন্ধ করে সোজা নিয়ে যাবে ঐ পাহাড়ের নীচে।

হাত দিয়ে দূরের অস্পষ্ট পাহাড় দেখিয়ে বলে ছেলেটা,—সেখানে গিয়ে তোর জান ইজ্জৎ সব খেয়ে লিয়ে ফেলে দিবে পাহাড়ের গর্ত্তে। আমি সঙ্গে থাকলে যমেও তোকে ছুঁতে সাহস করবে না বহেন!

দুর্ব্বল দেহে একসঙ্গে এতগুলো কথা বলে হাঁফাতে থাকে ছেলেটা। রাস্তার বাঁ পাশে উঁচু শুকনো একটা জায়গায় হাত ধরে বসিয়ে তারপর স্যুটকেশটা পেতে নিজে পাশে বসে বললে অচলা,—তোমার নাম কি ভাই?

—রামদয়াল। এখানে সবাই গুণ্ডা রামু বলে ডাকে।

—বাড়ি?

—এইখানেই।

—তুমি তো বেশ বাংলা বলতে পার রামদয়াল?

ম্লান হেসে রামদয়াল বলে,—আমি চার-পাঁচ বছর কলকাতায় ছিলাম, ইস্কুলে পড়তাম বহেন।

—পড়াশুনো ছেড়ে এই সব নোংরা কাজ কেন বেছে নিলে রামদয়াল?

—কেন নিলাম শুনবি বহেন? একটু চুপ করে থেকে বলতে শুরু করে রামদয়াল—জ্ঞান হবার পর থেকে মাকে দেখিনি। বাড়িতে ছিলাম আমরা তিন জন, আমি বাবা আর আমার ফুলিয়া বহেন। ফুলিয়া ছিল আমার এক বছরের ছোট। বাবা রেলে পয়েণ্টসম্যানের কাজ করত আর আমরা ছ' ভাই-বহেন খেয়ে দেয়ে পাহাড়ে জঙ্গলে খেলা করে বেড়াতাম। বছরের পর বছর কেটে গেল। একদিন বাবা ডেকে বললে—বেটা রামা, রাতদিন খেলা না করে একটু লিখা-পড়া শিখে নিতিস যদি, বাবুদের ধরে রেলে একটা ভাল চাকরী করে দিতে পারতাম। মুখ্যু হয়ে থাকলে সারাজীবন আমার মত কুলিগিরি করে কাটাতে হোবে। পরদিনই আমি আর ফুলিয়া পাঠশালায় ভর্ত্তি হয়ে গেলাম। বাড়ি থেকে ছ' মাইলের বেশি হেঁটে যেতে হয় পাঠশালায়। শরীর খারাপ বলে ছদিন আমি যাইনি—ফুলিয়া একেলা যেত-আসতো। একদিন এসে বললে আমাকে—ভেইয়া, কাল থেকে আমি আর পড়তে যাব না—পণ্ডিতটা লোক ভাল নয়! সব বুঝতে পারি, রাগে দিল জ্বালা করতে থাকে আমার। শরীর ভাল হলে এক দিন পাঠশালার ছুটির পর পণ্ডিতটাকে আচ্ছা ছ' চার ঘা দিয়ে এলাম ব্যস—পাঠশালার পড়া সেই দিন থেকে খতম।

হাঁফিয়ে ওঠে রামদয়াল। থেমে দম নেয়। কথা কইতে কষ্ট হচ্ছে জেনেও ওকে থামাতে ইচ্ছে করে না অচলার। চুপ করে থাকে।

রামদয়াল বলে,—বাবার এক দেশোয়ালি ভাইয়া কলকাতায় ট্রামে ড্রাইভারের কাজ করত। কি একটা পরবে এখানে এলে বাবা ওকে ধরে বসল। সহজেই রাজি হয়ে গেল কাকা, বললে—রাম, তুই চল আমার সঙ্গে কলকাতায়, আমার কাছে থেকে উখানে ইস্কুলে পড়বি।

বেশ বুঝতে পারলাম পড়াশুনার জন্য মাসে মাসে কিছু টাকা দেবার ব্যবস্থাও বাবা করে ফেলেছে কাকার সঙ্গে। গোল বাধল ফুলিয়াকে নিয়ে। জন্ম থেকে কোনও দিন দুজনে ছাড়াছাড়ি হয়নি, কেঁদে কেটে অস্থির। ধরে বসল, আমিও তোমার সাথে যাব ভেইয়া! অনেক করে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ঠাণ্ডা করে ওকে বলি, কলকাতার ইস্কুলে অনেক ছুটি। বছরে পাঁচ ছ'বার আসব আমি, তোর জন্যে বইখাতা ভাল শাড়ি কিনে আনব। ছুটিতে তোকে পড়াব আমি। শেষে রাজি হল।

তিন চার বছর বেশ কাটল। ছুটিতে এসে ওকে ইংরাজি কিছু কিছু বাংলা অঙ্ক শিখাই—কলকাতার গল্প করি। বাংলা শাড়ি কিনে আনি। ভারি খুশী বহেনটা। একদিন বাবা ডেকে বললে—বেটা রামা, ফুলিয়া তো একদম ধিঙ্গি হয়ে পড়েছে, ওর সাদির সব ঠিক করেছি আমি। যে লোকটাকে ঠিক করেছে বাবা—তাকে আমি চিনি। ষ্টেশনে মণিহারির দোকান আছে। পয়সা করেছে বেশ কিছু কিন্তু আদমীটা ভাল না। যেমন বিশ্রী দেখতে—স্বভাবও তেমনি। রাত-দিন তাড়ি-মদ গেলে আর কুলি ধাবড়ার আনাচে কানাচে উঁকি ঝুঁকি মারে।

বললাম,—ও শয়তানের সাথে ফুলিয়ার সাদি কিছুতেই দিতে দিব না আমি। ওর সাদি আমি নিজে দেখে শুনে ভাল ছেলের সাথে দিব।

কপালটা ব্যথায় টনটন করে ওঠে। ব্যাণ্ডেজের ওপর দুহাত দিয়ে কপালের রগ দুটো চেপে দম নেয় রামদয়াল।

অচলা বলে,—থাক থাক ভাইয়া, তোর কষ্ট হচ্ছে বলতে।

রামদয়াল বলে, কেউ জানে না, এ সব কথা, আজ তোকে সব বলে যাব আমি। কে জানে আর বলবার সময় পাব কি না। চার মাস বাদে ষ্টেশন মাষ্টারের একটা জরুরি তার পেয়ে ছুটে এলাম বাড়িতে। কি দেখলাম জানিস বহেন? খালি বাড়িটা খাঁ-খাঁ করছে। মাথায় লাঠি মেরে বাবাকে মেরে ফেলে ফুলিয়াকে নিয়ে

গেছে। অনেক চেষ্টা করে খবর নিয়ে জানলাম—একদিন অনেক রাতে তিন দুষমণ এসে মুখে কাপড় বেঁধে ফুলিয়াকে নিয়ে পালাচ্ছিল—বাবা বাধা দেয়, তখন লাঠি মারে। দু'দিন বাদে ফুলিয়ার লাশ পাওয়া গেল ঐ পাহাডটার কাছে একটা গর্ত্তে। অর্দ্ধেকটা জন্তু জানোয়ারে খেয়ে নিয়েছে, বাকিটা পচে ফুলে উঠেছে। কাছেই পেলাম রক্ত-মাখা শাড়িটা, যেটা দেওয়ালিতে আমি পছন্দ করে কিনে দিয়েছিলাম। হঠাৎ দু'হাত দিয়ে মুখ ঢেকে ছেলেমানুষের মত হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগল রামদয়াল। সমবেদনার ভাষা নেই, নীরবে পিঠে মাথায় হাত বুলাতে লাগল অচল্লা।

আস্তে আস্তে মুখ তুলে দূরের পাহাড়টার দিকে চেয়ে বলতে লাগল রামদয়াল, সেদিন ঐখানে বহিনটার লাশ ছুঁয়ে কসম নিয়েছিলাম, তোর এ অবস্থা যারা করেছে, নিজের হাতে তাদের আমি শেষ করবো ফুলিয়া বহেন! কলম ছেড়ে ছুরি ধরলাম। পুলিশ খবর পেয়ে এল, কিন্তু কিছুই করল না। পরে শুনলাম, টাকা দিয়ে ওদের মুখ বন্ধ করে দিয়েছে। বেদের মত রাতদিন ঘুরে বেড়াতাম। রাতে ঘুমুতে পারতাম না, মনে হত বহেনটা আমায় ডাকছে, ভেইয়া! ভেইয়া!

গলা ধরে আসে রামদয়ালের। একটু পরে বলে, অনেক চেষ্টা করে জানতে পারলাম এর মধ্যে একটা বাঙালী বাবু আছে। কয়েক মাস আগে থেকে ফুলিয়ার ওপর নজর পড়েছিল, অনেক চেষ্টা করেও যখন কিছু হল না, তখন বাইরে থেকে টাকা দিয়ে দুটো ভাড়াটে গুণ্ডা এনে এই কাজ করেছে। খোঁজ নিয়ে জানলাম তিনটে দুষমণই ডাল্টনগঞ্জ থেকে পালিয়েছে। একটার খোঁজ পেলাম পাটনায়, সেখানে গিয়ে সেটাকে শেষ করলাম, চার মাস বাদে আর একটার খবর পেলাম। শালা কলকাতায় পালিয়ে আছে। একদিন অনেক রাতে ভুলিয়ে নিয়ে এলাম শয়তানটাকে বালী ব্রীজের কাছে, সেইখানে তাকে শেষ করি। মারবার আগে দুষমণটা ঐ বাঙালী বাবুর কথা সব খুলে বলে। এইটেকে শেষ করতে পারলে আমার কাজ শেষ।

ফুলিয়া বহেনটাও শান্তিতে ঘুমাবে। তারপর দিক না আমায় ফাঁসি-জেল-দ্বীপান্তর, কুচ পরওয়া নহি।

পুবের আকাশ ফর্সা হয়ে আসে। সেই দিকে চেয়ে উঠে দাঁড়ায় রামদয়াল। বলে—ভোর হবার আগেই আমাকে ঐ পাহাড়-জঙ্গলে লুকোতে হবে বহেন! চল তোকে এগিয়ে দিয়ে আসি।

কয়েক পা এগিয়েই জিজ্ঞাসা করে রামদয়াল, কার বাড়ি যাবি? এখানে সবাই আমার চিনা। অচলা বলে, দত্ত সাহেবের বাড়ি, রিটায়ার্ড রেলওয়ে…। কথা শেষ করতে পারে না অচলা। পিছনে অস্ফুট আর্ত্তনাদ শুনে থমকে দাঁড়িয়ে ফিরে তাকায়। দেখে উত্তেজনায় রামদয়ালের বিরাট দেহ থরথর করে কাঁপছে, চোখ-মুখ লাল হয়ে গেছে। সাপের মত চাপা হিংস্র গর্জনে রামদয়াল বলে, উখানে তুই কেন যাবি বহেন? উরা তোর কে?
বিস্মিত হয়ে অচলা বলে, কেউ না। দত্ত সাহেবের ছেলের সঙ্গে আমার ছোট বহিনের বিয়ে হয়েছে। ব্যাপার কি ভাইয়া?

—ঐ বুড়া দত্ত সাহেবের বেটা সুধীরই তো তিসরা দুষমণ। ওকে শেষ করবার জন্যই তো মাটি কামড়ে পড়ে আছি আমি। তুই ওখানে যাস না বহেন, ও শয়তান সাপের মত বেইমান।

জবাব দিতে পারে না। অবসন্ন দেহে পথের ধারে বসে পড়ে অচলা।

ধীরে কাছে এসে পায়ের কাছে বসে রামদয়াল বলে, এত কথা আজ তোকে কেন বলছি জানিস বহেন? ভাবলেশ শূন্য চোখে তাকায় অচলা রামদয়ালের মুখের দিকে।

- কাল রাতে তোকে গাড়ি থেকে নামতে দেখে, চমকে উঠেছিলাম আমি। ঠিক যেন আমার ফুলিয়া বহেন বাঙালী মেয়ের পোষাক পরে ফিরে এসেছে আমার কাছে। ফুলিয়াও ঠিক তোরই মত দেখতে ছিল।

অচলা বলে, তবে দূর থেকে অন্ধকারে আমার পিছু নিয়েছিলি কেন?

—পকেট একদম খালি। কাল সারা দিন পেটে একটি দানাও পড়েনি। রাত হলে পাহাড় থেকে বেরিয়ে ক্ষিদেয় আর দাঁড়াতে পারি না। ষ্টেশনে একটা জানা আদমীর কাছ থেকে একটা চোলাই মদের পাঁট ধার নিয়ে এক নিশ্বাসে সেটা শেষ করে বেঞ্চের ওপর শুয়ে পড়লাম। ভেবেছিলাম ঘুমিয়ে পড়লে সব ভুলে যাব। পিছু নিয়েছিলাম খানিকটা দূরে গিয়ে, তোর কাছ থেকে কিছু টাকা চাইব বলে।

—যদি না দিতাম ?

—আমি জানি না দিয়ে তুই পারতিস না বহেন! একটু থেমে আবার বলে,—সবার সামনে আওরতের কাছে ভিখ মাঙতে আমার সরম লাগে দিদি !

অচলা বলে,—সুধীরের কথা কি বলছিলে ?

নিমেষে চোখ-মুখ আবার কঠিন হয়ে ওঠে রামদয়ালের, বলে,—বছর তুই হল বুড়া দত্ত সাহেব চাকরী ছেড়ে এখানে বাড়ি করেছে। সুধীর কলকাতায় কলেজে পড়তো। সেই সময় থেকে ছুটিতে এখানে এসে ফুলিয়ার ওপর নজর দিত, সুবিধে করতে না পেরে টাকা দিয়ে লোক লাগিয়ে এই কাজ করেছে। শেষে ভয়ে পালিয়ে যায় বর্মায়। আজ ক'মাস হল ফিরেছে। শালা ভয়ে রাতের বেলা বার হয় না। আরও কি করেছে জানিস বহেন? সদরে গিয়ে ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে আমার নামে গ্রেপ্তারি পরওয়ানা বার করেছে। তাইতো দিনের বেলা পাহাড়ে জঙ্গলে লুকিয়ে থাকি, রাতে ষ্টেশনে এসে শুই।

—অচলা বলে, ষ্টেশনের ওরা যদি ধরিয়ে দেয় ?

—সাহস করবে না। তাছাড়া ওরা সবাই আমায় ভালবাসে বহেন। কেন যে গুণ্ডামি করি তাও জানে। কপালের ক্ষত থেকে রক্ত চুঁইয়ে মুখ বেয়ে কলিদার আদ্দির পাঞ্জাবীটার ওপর পড়ে। ভয় পায় অচলা, বলে,—ভাইয়া আর কথা বলিস না। তোর সব কথাই আমি বিশ্বাস করেছি।

একটা তৃপ্তির হাসি ফুটে ওঠে রামদয়ালের মুখে। স্যুটকেস খুলে দশ টাকার দু'খানা নোট বার করে রামদয়ালের দিকে এগিয়ে দিয়ে অচলা ধরা গলায় বলে—আমারও তিনকুলে কেউ নেই ভাইয়া, বহেন বলে ডেকেছিস, সেই দাবীতেই এটা দিচ্ছি। না নিলে মনে করবো তোর সব কিছু ঝুঠা।

তন্দ্রাচ্ছন্নের মত হাত পেতে টাকা নেয় রামদয়াল, চোখ দুটো ছল ছল করে ওঠে।

অচলা বলে— আর একটা কথা তোকে রাখতে হবে ভাইয়া।

জিজ্ঞাসু চোখে তাকায় রামদয়াল।

—সুধীরকে ছেড়ে দিতে হবে। ও বিয়ে করেছে আমার ছোট বোনকে। মেয়েটা বড় ভাল রে রামদয়াল, সুধীরের কিছু হলে ও প্রাণে বাঁচবে না। তোর একটা বহেনকে খুশী করতে আর দুটো বহেনকে এত বড় আঘাত তুই দিসনে ভাই।

বিমূঢ়ের মত ফ্যাল-ফ্যাল করে শুধু চেয়ে থাকে রামদয়াল।

অচলা বলে—তা ছাড়া ভেবে দেখ ভাই, মেরে ফেললে ওর শাস্তিটা কী হল? তার চেয়ে বেঁচে থেকে তোর ছুরীর ভয়ে সারা-জীবন তিলে তিলে দগ্ধ হয়ে মরবে ও। কোন্‌টা ভাল?

অচলার হাত দুটো ধরে ক্ষত-বিক্ষত বিবর্ণ মুখখানা তার ওপর রেখে কেঁদে ফেলে রামদয়াল।

ভোর হয়ে আসে। দূরে অস্পষ্ট দু-একটি পথচারীকেও দেখা যায় যেন।

অচলা ডাকে—ভাইয়া, কথা দে আমায়।

—তুই ঠিক বলেছিস বহেন, জবান দিলাম তোকে। আজই ঐ পাহাড়ের নীচে ছুরি ফেলে দিয়ে ফুলিয়া বহেনের কাছে মাপ চেয়ে লিব। উঠে দাঁড়িয়ে অচলাকে বলে, তুই যা বহেন, সামনের ঐ মোড়টা পেরিয়ে গেলেই ডান দিকের সাদা বাংলো বাড়ির সামনে লোহার গেট।

এগুতে গিয়ে আবার দাঁড়ায় অচলা, বলে,—কিছু খেয়ে নিয়ে ডাক্তার দেখিয়ে আজই ডাল্টনগঞ্জ থেকে চলে যা ভাইয়া।

অবসন্ন অনিচ্ছুক পা দুটো টেনে টেনে এগিয়ে চলে অচলা।

সামনে ছোট্ট লনে পায়চারি করছিলেন দত্ত সাহেব। অচলাকে দেখে তাড়াতাড়ি লোহার গেটটা খুলে ভিতরে চলে গেলেন।

গেট ভেজিয়ে দূরে দৃষ্টি প্রসারিত করে দেখলে অচলা, রাস্তা ছেড়ে সামনের ধূ ধূ প্রান্তর বেয়ে টলতে টলতে চলেছে সর্ব্বহারা আধমরা হিন্দুস্থানী ছেলেটা। চলতে চলতে পড়ে যাচ্ছে আবার অতিকষ্টে উঠে পা দুটো টেনে টেনে চলছে, লক্ষ্য ওর দূরের ঐ পাহাড়টা।

সদ্য ঘুম ভেঙে বাইরে এসে অচলাকে দেখে চীৎকার করে উঠল শর্বরী—দিদি! সত্যি এলে তুমি? পরক্ষণেই অবাক হয়ে বলে—কিন্তু এত ভোরে এলে কি করে? রাত্রে ষ্টেশনে তো গাড়ি থাকে না, কার সঙ্গে এলে?

তেমনি ভাবেই জবাব দেয় অচলা—একলা।

পাশ থেকে শর্বরীর স্বামী বলে ওঠে,—একলা? সত্যি সাহস আছে আপনার। শর্বরীর কাছে আপনার সব কথা শুনে সত্যি বলছি বিশ্বাস হয়নি আমার। কিন্তু রাত্রে ডাল্টনগঞ্জের পথে মেয়েছেলে হয়ে একলা অক্ষত দেহে যখন আসতে পেরেছেন—আপনার পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়।

কাছে এসে শর্বরী বলে,—এ কি, কাপড় চোপড় সব কাদাজলে মাখামাখি, পড়ে গিয়েছিলে বুঝি? ঘরে এস দিদি!

ঘরে যাবার উৎসাহ অনেক আগেই চলে গেছে অচলার। ভাবছিল—কোনও রকমে এখান থেকে এই ধুলো পায়ে রাঁচি ফিরে যাওয়া যায় না।

সুধীর বললে,—শুধু পড়ে গিয়ে রেহাই পেয়ে গেছেন এইটেই তোমার দিদির ভাগ্য বলে মনে কর। কোনো গুণ্ডা বদমাসের হাতে পড়লে, বিশেষ করে রামু ব্যাটার নজরে পড়লে ফিরে আসতে হত না—পথেই পড়ে থাকতে হত। ব্যাটা পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে তাই রক্ষে।

দূরে উঁচু পাথরের টিবিটার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেছে রামদয়াল—হয়তো পড়ে আছে উঠতে পারছে না। জল ভরা চোখে দেখা যায় না তবুও চেয়ে থাকে অচলা।

সুধীর বললে,—তোমার বান্ধবীকে ভিতরে নিয়ে যাও, আমি চায়ের ব্যবস্থা করতে বলি। অচলা ভাবছিল, তার ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের গণ্ডির মধ্যে মামা অতুল বাবু, দাশু ঘটক, অরবিন্দ, নিখিল, শর্বরীর স্বামী এই সুধীর, আর ঐ পলাতক খুনে গুণ্ডা রামদয়াল,—এদের সবাইকে এক সঙ্গে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দিলে, মানুষের বিচারে যাই হোক না কেন, আর একজনের বিচারে কার অপরাধের বোঝা সব চেয়ে ভারি হয়ে উঠবে?

শর্বরী বললে,—চুপ চাপ ঐ দিকে চেয়ে কি দেখছ দিদি? ভেতরে এস। পরক্ষণেই অচলার দৃষ্টি অনুসরণ করে বলে,—ওঃ পাহাড়ের ফাঁকে সূর্য্যোদয় দেখছ বুঝি? সত্যি দিদি এখানে আর কিছু থাক বা না থাক,—ভোরের সূর্য্যোদয়টা অদ্ভুত! এখানে এসে প্রথম ক'দিন আমিও তোমার মত হাঁ করে চেয়ে থাকতাম।

ঊর্দ্ধে পাহাড়ের উপর দৃষ্টি পড়ল। পূবের খানিকটা আকাশ আর পাহাড়টার চূড়ায় কে যেন টকটকে লাল আবির ঢেলে দিয়েছে। অচলার মনে হল, ফুলিয়া আর রামদয়ালের টাটকা রক্তে স্নান করে উঠে ডাল্টনগঞ্জের প্রভাতী-সূর্য্য চোরের মত পাহাড়ের আড়াল থেকে উঁকি মারছে।

দাম

জ্বরের ঘোরে আট মাসের মেয়েটা কেঁদে ওঠে। সুমিতার তন্দ্রা ভেঙে যায়, তাড়াতাড়ি উঠে কাঁথা শুদ্ধ মেয়েটাকে কোলে তুলে নেয়, তারপর কাঁচের গ্লাসে চীনেমাটির প্লেট দিয়ে ঢাকা দুধ মেশানো বার্লি একটু একটু করে ঝিনুক দিয়ে খাইয়ে দেয়—আবার ঘুমিয়ে পড়ে মেয়েটা। সুমিতা কিন্তু ঠায় তেমনি বসে থাকে। কুলুঙ্গিতে ছোট্ট টাইম পিসটার ওপর দৃষ্টি পড়ে, রাত ঠিক একটা। অজান্তে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস বেরিয়ে আসে। পিছু হটতে হটতে সুমিতা তিন বছর আগের বাপের বাড়িতে চলে আসে।

মনে হয় যেন কালকের কথা। সন্ধ্যে বেলায় সিনেমা দেখে ফিরতেই বাইরের ঘরে বাবার সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। আদর করে কাছে টেনে এনে জিজ্ঞাসা করেন—আজ এত হাসিখুশি—ব্যাপার কি মা?

উচ্ছ্বসিত হয়ে সুমিতা বলে—আজ 'জোনাকি' বলে একটা ছবি দেখে এলাম বাবা, চমৎকার ছবি—তাতে হিরোর পার্ট করেছে একটি নতুন ছেলে প্রশান্ত রায়, কী চমৎকার চেহারা!

বাপ মায়ের একমাত্র আদরের মেয়ে সুমিতা। বাবা হরলাল বোস ভাল মাইনেতে সদাগরি আফিসে চাকরি করেন। বালীগঞ্জে নিজেদের বাড়ি, ব্যাঙ্কেও কিছু টাকা আছে, সব মিলিয়ে অবস্থা বেশ ভালই বলা চলে।

ছোটবেলা থেকে সুমিতার কোনও আব্দারই অপূর্ণ থাকেনি। ম্যাট্রিক পাশ করার পর সুমিতার সিনেমা দেখা বেশ একটু বেড়েই গেছে।

হরলালবাবু হেসে বললেন—শুধু চেহারাটাই চমৎকার, না অভিনয়ও?

—হুইই। বলে ভ্যানিটি ব্যাগটার ভেতর থেকে প্রোগ্রামখানা টেনে বার করে সুমিতা—তারপর প্রশান্ত রায়ের একক একখানা ছবি তার মধ্যে থেকে বার করে বাপের চোখের ওপর মেলে ধরে।

কিছুক্ষণ ছবিটার দিকে তাকিয়ে হরলালবাবু বলেন—হুঁ চেহারাটা ভালো বলতেই হবে।

তারপর ছুতিন সপ্তাহ যেন স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে কাটে। কলেজের পড়ায় মন দিতে পারে না সুমিতা, বই খুলে বসলেই হিজিবিজি লেখাগুলোর ভেতর থেকে প্রশান্তর ড্যাব ডেবে চোখ ছুটো সুমিতার মুখের দিকে চেয়ে থাকে। বই বন্ধ করে চোখ বুজে শুয়ে পড়ে সুমিতা। এরই মধ্যে আরও চারবার 'জোনাকি' ছবিটা দেখে এসেছে সুমিতা—তবুও আশা মেটে না—আবার দেখতে ইচ্ছে করে।

সামনের রবিবারে কলেজ-বন্ধু নিভাকে নিয়ে আবার দেখতে যায়। শো শেষ হবার পর লবিতে দেখা হয় প্রশান্তর সঙ্গে—হঠাৎ। অনেক ছেলেমেয়ে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে চারপাশে। লবিতে বুকিং-এর প্রসারিত তক্তার ওপর ঠেশান দিয়ে নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে প্রশান্ত রায়। অপলক চোখে চেয়ে থাকে সুমিতা, তারপর নিভাকে ঠেলে দিয়ে বলে—যা না আলাপ করে আয়। একরাশ ছেলেমেয়ের সামনে লজ্জা করে, ছু পা গিয়ে থমকে দাঁড়ায় নিভা। শেষকালে সুমিতাই সাহস করে এগিয়ে গিয়ে নমস্কার করে বলে—আপনার অভিনয় আমাদের খুব ভালো লাগে—পাঁচ ছবার দেখেছি।

ছোট্ট একটা—ওঃ, বলে চুপ করে থাকে প্রশান্ত।

আশেপাশের ভিড় ক্রমশঃই বাড়তে থাকে। হঠাৎ সুমিতা বলে—একদিন আমাদের বাড়িতে আসবেন? বাবা আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চান।

প্রশান্ত সুমিতার সারা দেহে চোখ বুলিয়ে বলে—কোথায় আপনাদের বাড়ি?

ঠিকানা বলে নিভাকে নিয়ে ঐ সহস্র কৌতূহলী চোখের ওপর দিয়ে ভিড় ঠেলে সুমিতা রাস্তায় এসে দাঁড়ায়।

এক মাস পরে। প্রশান্ত প্রায়ই আসে সুমিতাদের বাড়ি। সিনেমা থেকে শুরু করে রাজ্যের গল্প মেলে ধরে সুমিতার রঙিন চোখের সামনে। মাঝে মাঝে হরলালবাবু এসে বসেন। একদিন সিনেমার প্রসঙ্গে হরলালবাবু বললেন—পেপার গুলোতে 'জোনাকি' ছবিটায় তোমার অত নিন্দে করলো কেন বুঝলাম না। সুমি তো বলে তোমার অভিনয় চমৎকার হয়েছে। বিজ্ঞের মত একটু হেসে প্রশান্ত জবাব দেয়—তাহলে আপনাকে ভেতরের কথা সব খুলেই বলি। ছবি রিলিজের পর ওরা সব দল বেঁধে আমার কাছে এসেছিল, বলে হোটেলে একদিন ভালো করে ডিনার দাও, কেউ কেউ আবার নগদও চেয়ে বসলো কিছু।

বললাম—এর মানে কি? নতুন নামছি—কোথায় আপনারা দোষ ত্রুটি ওভার লুক করে এনকারেজ করবেন তা নয় উল্টে বাধা দিচ্ছেন? তাছাড়া আমি ভালো অভিনয় করেছি—ভালোকে ভালো বলতেও আপনাদের আপত্তি?

কৌতুহলী হরলালবাবু বললেন—উত্তরে কি বললে ওরা?

প্রশান্ত বললে—বলবার আর ছিল কি—তবু বললে—দেখ আমরা হচ্ছি স্টার মেকার—রাতারাতি ওপরে তুলতেও পারি নীচে নামাতেও পারি। আমাদের পিঠের ওপর দিয়ে ধাপে ধাপে ওপরে উঠে গিয়ে মাসে মাসে হাজার হাজার টাকা রোজগার করবে—সুতরাং ওপরে ওঠবার ফি-টাই বা দেবে না কেন?

হরলালবাবু—তুমি কি বললে?

প্রশান্ত বললে—সাফ বলে দিলাম, আই ডিফাই ইউ! নিজের ক্ষমতায় ওপরে উঠবো—তোমাদের ক্ষমতা থাকে বাধা দাও। সেই জন্যেই তো রাঙামুখো মাকাল ফল এই সব লিখেছে কাগজে।

যেটুকু মেঘ মনের কোণে জমেছিল—কেটে গেল। আনন্দে গর্বে সুমিতার বুকটা ভরে ওঠে, ভাবে—এই না হলে সত্যিকারের মানুষ।

প্রশান্তর কাছেই একদিন সুমিতা শুনলে—ওদের বাড়ি পূর্ববঙ্গে, ছোটখাটো জমিদার বললেও বাড়িয়ে বলা হয় না। দেশ বিভাগ হওয়ার জন্য একটু অসুবিধে হয়েছে—তাহলেও দেশে যা জমিজমা আছে তাতে বিধবা মা আর তিন চারটে ভাইবোনের বেশ রাজার হালেই চলে যাচ্ছে। ছেলেবেলা থেকেই প্রশান্তর সিনেমার দিকে ঝোঁক, তাই বি, এ, পাশ করার পরই ছবিতে নেমেছে।

আর চাই কি। বিয়ের কথা একরকম পাকাপাকি হয়ে গেল। ওরই মধ্যে একদিন হরলালবাবু সুমিতাকে ডেকে বললেন—বড্ড তাড়াতাড়ি হয়ে যাচ্ছে মা, আরও একটু খোঁজ খবর নিয়ে—

বাধা দিয়ে অভিমান ক্ষুব্ধ কণ্ঠে সুমিতা বলেছিল—ছিঃ বাবা, তুমিই না বলতে মানুষকে বিশ্বাস করে ঠকাও ভালো।

হরলালবাবু চুপ করে গিয়েছিলেন। এরপর আর কোনও বাধা আসেনি।

বিয়ের পর সুমিতা বাপের বাড়িই রয়ে গেল। প্রশান্ত মেসে থাকে, মাঝে মাঝে শ্বশুর বাড়ি কাটায়—মাস খানেক পর আর মেসে যায় না সুমিতাদের ওখানেই থেকে যায়। বাবা মা বলেন—আহা থাক না—একটা তো মেয়ে।

পাড়ার লোকে কানাকানি করে। একদিন হরলালবাবু প্রশান্তকে বললেন—বাবা, তুমি ছোটখাটো দেখে একটা বাড়ি ভাড়া কর—ভাড়া আমিই দিয়ে দেব।

প্রশান্ত লজ্জা পেয়ে বলে—দেখুন কথাটা আপনাকে খুলে বলাই ভালো। দেশের জমিদারি থেকে মাসে মাসে যে টাকাটা এক্সপেক্ট করেছিলাম, এখন দেখছি—পাকিস্তান থেকে টাকা পাঠানো অসম্ভব। নায়েব লিখেছে মধ্যে দুতিনবার কিছু টাকা পাঠিয়ে ছিল্—কিন্তু তা আমি পাইনি। তাছাড়া কাগজওয়ালাদের চটিয়ে দিয়ে ছবির কাজ পেতেও দেরি হচ্ছে—তাই—

হরলালবাবু বললেন—বুঝিছি—বেশ যতদিন তোমার কাজ না হয়, সংসার খরচ আমিই চালিয়ে নেব—এতে তুমি কিন্তু হচ্ছ কেন?

ভবানীপুরে নতুন বাসায় এসে নিরবচ্ছিন্ন সুখের মধ্যে দিয়ে একটানা স্রোতের মত কেটেছিল বোধ হয় পুরো একটা বছর। তারপর এল ঢেউ। মাত্র তিন দিনের জ্বরে সুমিতার মা হঠাৎ অসহায় হরলালবাবুকে ফেলে মারা গেলেন।

চারদিক অন্ধকার দেখলো সুমিতা। হরলালবাবুর দেখা শোনা, খাওয়া-দাওয়া সব ভারই নিতে হল সুমিতাকে—নতুন বাসায় রইল শুধু প্রশান্ত, ঠাকুর আর ঝি। রাতদিন সুমিতা বাবার কাছেই থাকে—মাঝে মধ্যে দুএক ঘণ্টা বাসায় ঘুরে আসে, আর মাসের শেষে সংসার খরচের টাকাটা হরলালবাবুর কাছ থেকে নিয়ে প্রশান্তকে দিয়ে আসে। এই ভাবে মাস তিনেক কাটলো। একদিন হরলালবাবু ডেকে বললেন—এইবার তুমি বাসায় চলে যাও মা, প্রশান্তর কষ্ট হচ্ছে। ঠাকুর চাকর রয়েছে আমার কোন কষ্ট হবে না। তা ছাড়া কাল থেকে আমি আফিস বেরুবো মনে করছি—শুধু শুধু বাড়ি বসে থাকতেও আর ভাল লাগছে না।

দু একবার ক্ষীণ আপত্তি তুলেছিল সুমিতা, টেঁকেনি, অগত্যা নতুন বাসায় চলে আসতে হোলো। কথা রইলো যখনই সময় পাবে এসে বাবাকে দেখে যাবে। বাসায় এসে সুমিতার চক্ষুস্থির, বিছানাপত্তর থেকে শুরু করে সব কিছুই এলোমেলো, একটা অলক্ষ্মীর শ্রী যেন সব কিছুতে লেপ্টে আছে। ঝিটাকে ডেকে বেশ বকুনি দিয়ে সব পরিষ্কার করতে লেগে গেল সুমিতা। আলনায় একরাশ ময়লা জামা কাপড় জড় করা রয়েছে—সেগুলো কাচতে দিতে হবে। হঠাৎ একটা ময়লা সার্টের পকেট থেকে একখানা পোস্টকার্ড বার করলো সুমিতা, বরিশাল থেকে দশ বারোদিন আগে লেখা। ঠিকানা ঠিকই লিখেছে কিন্তু নাম লিখেছে—মনোহর দাস। প্রথমে সুমিতা মনে কোরলো অন্য কারও চিঠি, দু লাইন পড়বার পর ভুল ভেঙে গেল, অশিক্ষিতা মেয়েলি হাতের লেখা, লিখেছে—বাবা খাঁদু,

ছ'মাস হইল তোমার একখানি পোস্টকার্ড পাইয়াছিলাম, উহাতে জানাইয়াছিলে তুমি বাইশকোপে ভালো কাজ পাইয়াছ আর

পয়সার ভাবনা নাই—কিন্তু অদ্যাবধি দশ বারোখানি পত্র দিয়াও তোমার কোনও খবর পাই না—ইহার কারণ কি? সবগুলি পত্রই তোমার বাইশকোপের অফিসের ঠিকানায় দিয়াছি। আমাদের পাড়ার হারু মুক্তারের ছেলে অটল আজ দিন পনেরো হইল বাড়ি আসিয়াছে, উহার কাছেই তোমার এই বাসার ঠিকানা পাইলাম। অটল আরও একটা কথা বলিল। তুমি নাকি এক বড় মানুষের মেয়ে বিয়া করিয়াছ। আমি বিশ্বাস করি নাই কিন্তু বউমা রাত দিন কাঁন্দিয়া বুক ভাসাইতেছে। পত্রপাঠ সব খুলিয়া লিখিবা। আমরা এখানে প্রায় অনশনে দিন কাটাইতেছি—পত্র পাইবা মাত্র যাহা পার পাঠাইবা। তোমার ছোট ভাইবোনগুলি ছ'মাসের উপর ইস্কুলের মাহিনা দিতে পারে নাই, নাম কাটিয়া দিয়াছে। তোমার পত্র পাইলে আর সব জানাইব। আমার আশীর্বাদ নিবা। ইতি—

তোমার দুঃখিনী মা।

চিঠি পড়ে সুমিতার সাধের অট্টালিকা নিমেষে ধূলিসাৎ হয়ে গেল। মিথ্যা, মিথ্যা, যা কিছু বলেছে প্রশান্ত সব নির্লজ্জ মিথ্যা। আর এই মিথ্যার হাটে নিজের সব কিছুই উজাড় করে বিক্রী করেছে সুমিতা। একবার ভাবলে চিঠি খানা নিয়ে বাবার কাছে যাই। আবার তখনি মনে হ'ল—কি লাভ হবে? অনর্থক তাঁর দুঃখের বোঝাটা আরও ভারি হয়ে উঠবে। তাছাড়া তিনি তো সুমিতাকে প্রথমেই সাবধান করে দিয়েছিলেন। সেই তো স্বেচ্ছায় দিক বিদিক জ্ঞান হারিয়ে আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, এখন পুড়ে মরা ছাড়া অন্য পথই বা কি আছে। সুমিতা ঠিক করলো তার পোড়া অদৃষ্টের কথা সে কাউকে জানাবে না, যা থাকে কপালে।

সেদিন অনেক রাত্রে মাতাল হয়ে বাড়ি ফিরলো প্রশান্ত, সঙ্গে তিন চারটি ইয়ার বন্ধু। বাড়ি ঢুকেই ঠাকুরের কাছে শুনলো সুমিতা এসেছে, ইয়ার বন্ধুর দল নিতান্ত অনিচ্ছায় সরে পড়লো। চেষ্টা করে নিজেকে খানিকটা সংযত করে ওপরে উঠে গেল প্রশান্ত। শোবার ঘরে মেঝেতে বসে ছিল সুমিতা। ঘরে ঢুকে খাটখানা ধরে

টাল সামলে নিল প্রশান্ত, তারপর হেসে বললে—তবু ভালো—এতদিন বাদে বেচারা স্বামীটিকে মনে পড়লো।

এই প্রথম সুমিতা প্রশান্তকে মাতাল দেখলো—ওযে মদ খায় এধারণাও সুমিতার ছিল না, কিন্তু আজ মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছে সুমিতা কোনও কিছুতেই অবাক হবে না।

শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বললে সুমিতা—রাত অনেক হয়েছে, খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়ো।

এগিয়ে এসে বিছানার ওপর ঝুপ করে বসে পড়লো প্রশান্ত, তারপর গায়ের পাঞ্জাবীটা খুলতে খুলতে বললে—পরিচালক সান্যালের ওখান থেকে খেয়ে এসেছি। কাল সুমি একটা ভাল চান্স পাবই।

আজ পরিষ্কার বুঝতে পারলো সুমিতা এতদিন যে ধাপ্পা দিয়ে এসেছে প্রশান্ত এও তাই। মাকালফলের মত বাইরের ওই সুন্দর খোলসটা ছাড়া আর যে কিছুই নেই প্রশান্তর সেটা বুঝতে এত দেরি কেন হ'ল সুমিতার ভাবতেও অবাক লাগে।

হঠাৎ ঝুঁকে পড়ে খপ করে সুমিতার একখানা হাত ধরে প্রশান্ত বলে—আজ হ'ল কি তোমার সুমি? এতদিন বাদে যদি বা দেখা পেলাম—মুখ ভার করে দূরে দাঁড়িয়ে রইলে—এস!

সবলে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে এক কাণ্ড করে বসলো সুমিতা, বিছানার নীচে থেকে পোস্টকার্ডখানা টেনে বার করে প্রশান্তর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বললে—নিজের নাম ধাম এমন কি আগে বিয়ে একটা করেছ এখবরটা পর্যন্ত গোপন করে আমার এত বড় সর্বনাশ তুমি কি করে করতে পারলে? তোমাকে—আর বলতে পারলো না, রুদ্ধ কান্নায় ভেঙে পড়লো সুমিতা মেঝের ওপর।

আস্তে আস্তে উঠে বসলো প্রশান্ত খাটের ওপর, তারপর সংযত কণ্ঠে বললে—অপরাধ আমার হয়েছে স্বীকার করছি—কিন্তু তুমি, তুমি কি কোনও অপরাধ করোনি?

জলভরা চোখ দুটো তুলে প্রশান্তর দিকে তাকায় সুমিতা। যেন নিজের মনেই বলে চলে প্রশান্ত—হ্যাঁ, তুমি সুন্দরী, শিক্ষিতা, ধনী

বাপের একমাত্র আদরিণী মেয়ে, তুমি শত প্রলোভন মেলে হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেলে আমার চোখের সামনে—সব কিছু আমার ওলোট পালোট হয়ে গেল। তোমাকে পাবার জন্য ওর চাইতে অনেক বড় অপরাধ করতেও প্রস্তুত ছিলাম আমি। তবুও ওরই মধ্যে দুদিন তোমাকে সব কথা বলবার চেষ্টা করেছিলাম—তুমি বলতে দাওনি—বলেছিলে—ভালবাসি তোমাকে, তোমার পেছনের ইতিহাসকে নয়, মনে পড়ে সুমিতা ?

সুমিতা জবাব দেয় না, দেবার ছিলও না কিছু। প্রশান্ত একটু দম নিয়ে আবার শুরু করে আজ দৈবাৎ সেই পুরোনো ইতিহাসের একটা টুকরো হাতে পেয়েই এত মুষড়ে পড়লে চলবে কেন ? ভাল বেসেছিলে সিনেমার নায়ক প্রশান্ত রায়কে—সে তো স্বশরীরে হাজির, ইতিহাস যাক না রসাতলে—তা নিয়ে মাথা ঘামাও কেন ? বলতে বলতে উন্মাদের মত হো হো করে হেসে ওঠে প্রশান্ত—হাসি যেন থামতেই চায় না। লজ্জায় ঘেন্নায় মাটির সাথে মিলে যেতে চায় সুমিতা।

এর পরও ছ মাস কেটে যায়। ছ মাস্ তো নয়—ছ বছর মনে হয় সুমিতার। এর মধ্যে অনেক কিছুই ঘটে গেছে, হরলালবাবু মাস দুই আগে আফিসের এক সহকর্মীর বয়স্থা মেয়েকে বিয়ে করে দীর্ঘ ছুটি নিয়ে সস্ত্রীক হাওয়া বদলাতে কলকাতার বাইরে চলে গেছেন। যাবার সময় সুমিতাকে স্পষ্টই বলে গেছেন—দেখো মা, আমি তো দু বছরের ওপর চালিয়ে দিলাম, এইবার প্রশান্তকে একটা কাজকর্ম খুঁজে নিতে বল, ছবির কাজ না জোটে কোনও আফিসে কেরানীগিরি করলেও তোমাদের চলে যাবে। তাছাড়া তোমার নতুন মা—এসেই পয়সা কড়ি হিসেব পত্তর সব নিজের হাতে নিয়েছেন—সবই তো বুঝতে পারছো মা।

সবই বুঝতে পারে সুমিতা, আর এও যে হবে এটাও যেন অনুমান করে নিয়েছিল সুমিতা। পরের মাস থেকে শুরু হল গয়না বিক্রি—আরও কিছুদিন কেটে গেল। হতভাগা মেয়েটাও সুযোগ বুঝে এই সময় হাজির হয় এই ছন্নছাড়া সংসারে। তারপর—পালঙ্ক, টেবিল,

চেয়ার—দামী রেডিও! মাস ছয়েক পরে আর বিক্রি করবার মতও কিছু অবশিষ্ট থাকে না। বাড়ি ছেড়ে দিয়ে উঠে আসে একখানা ঘর নিয়ে এই বস্তিতে—তাও মাস দুই হয়ে গেছে।

হঠাৎ সমস্ত বস্তিটাকে সচকিত করে কে যেন বাইরের দরজার কড়াটা সজোরে নাড়তে শুরু করে। স্বপ্ন ভেঙে যায় সুমিতার। চকিতে নজর পড়ে কুলুঙ্গির মধ্যে টাইম পিসটার ওপর, তিনটে বেজে গেছে। তাড়াতাড়ি হ্যারিকেনের আলোটা বাড়িয়ে দিয়ে দোর খুলতে যায়।

দোর খুলে সভয়ে এক পা পিছিয়ে দাঁড়ায় সুমিতা—হাতের হ্যারিকেনের স্বল্প আলোতে দেখলো—দরজার বাইরে ঈষৎ অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে প্রশান্ত। কপালে বেশ খানিকটা কেটে লাল রক্ত জমাট বেঁধে কালো হয়ে গেছে। তারই খানিকটা ছিটকে পড়েছে সাদা পাঞ্জাবীটার ওপর। কাপড় ও জামায় কাদা মাখা—বোধহয় পড়ে গিয়েছিল রাস্তায় বা ড্রেনে। জড়িত স্বরে প্রশান্ত বলে—সঙ-এর মত দাঁড়িয়ে দেখছ কি, ঘরে যাবে না? অন্য কেউ থাকে তো বল আর একটু ঘুরে আসি।

সম্বিত ফিরে আসে সুমিতার—কোনও মতে হাত ধরে টলটলায়মান প্রশান্তকে ঘরে এনে দরজায় খিল লাগিয়ে দেয়। তারপর অনেক কষ্টে জামা কাপড় ছাড়িয়ে ছেঁড়া লুঙিটা পরিয়ে দিতেই ঝুপ করে শুয়ে পড়ে প্রশান্ত মেজেয় পাতা ঢালা বিছনাটার ওপর। কলাই উঠে যাওয়া বাটিটায় কলসি থেকে খানিকটা জল গড়িয়ে একফালি ন্যাকড়া নিয়ে বিছানার একপাশে বসে পড়ে সুমিতা। তারপর আস্তে আস্তে ভিজে ন্যাকড়া দিয়ে মুখের ও কপালের জমাট রক্তগুলো পরিষ্কার করতে শুরু করে।

আরাম লাগে, চোখ বুজে জড়িতস্বরে বলতে শুরু করে প্রশান্ত —জানো সুমি, শালা ডিরেক্টর বটব্যাল, ব্যাটা কিচ্ছু জানে না—শুধু হিরোইন মনীষা গুপ্তকে ভাঙিয়ে খাচ্ছে—আজ দিয়েছি ব্যাটাকে বেশ দুকথা শুনিয়ে।

বহুবার শোনা পুরোনো কথা, চুপ করে শোনে সুমিতা আর ভিজে ন্যাকড়াটা বুলিয়ে যায় কপালের ওপর।

বকে বকে একটু যেন ঝিমিয়ে পড়ে প্রশান্ত—ওরই মাঝে শুধু একবার জিজ্ঞাসা করে সুমিতা—খুকীর ওষুধটা এনেছ ?

—হ্যাঁ নিশ্চয়ই। উত্তেজনায় উঠে বসে প্রশান্ত—পরক্ষণেই আবার শুয়ে পড়ে বিছানায়, তারপর বলে—ব্যাপারটা কি হয়েছে জান ? ওষুধটা কিনে দাম দিয়ে কাউণ্টারের ওপর রেখে চেঞ্জগুলো দেখে নিচ্ছি—এমন সময় মোটরে করে কি একটা ওষুধ কিনতে হাজির হোলো—বটব্যাল। আমায় দেখেই বলে উঠল—এই যে রায়, আজ কদিন ধরে তোমায় খুঁজছি। বললাম—ব্যাপার কি ?

এখানে বলা চলে না—ওঠ গাড়িতে। বলে একরকম জোর করে আমায় গাড়িতে তুলে বাড়ি নিয়ে গিয়ে তুললে। ঘরে ঢুকে খাতির দেখে কে। তারপর বিলাতী হুইস্কির বোতল বার করছে দেখে বললাম—আজ ওসব খাব না। মেয়েটার বড্ড অসুখ করেছে। কে কার কথা শোনে।

একটু থেমে দম নিয়ে আবার বলতে শুরু করে প্রশান্ত,—আজে বাজে কথায় সময় কেটে যাচ্ছে দেখে বললাম—কি জন্যে আমায় এনেছ বললে নাতো ? ড্রয়ার থেকে একটা খাতা টেনে বার করে বটব্যাল বললে—নতুন একটা গল্প ঠিক করেছি—আর এতে তোমাকে নায়ক সাজাব ভাবছি। শুনলাম গল্পটা। বটব্যাল জিজ্ঞাসা করলে—কেমন লাগল ? বললাম—রটন্। বুঝলাম—মনে মনে চটলো ব্যাটা। আমিই জিজ্ঞাসা করলাম—নায়িকা মিলির পার্ট করবে কে ?

বটব্যাল বললে—মনীষা গুপ্তা। হেসে বললাম—ও আবার অভিনয় করতে শিখলো কবে ? শুধু ড্যাব ডেবে চোখ ছুটো দিয়ে চাওয়া আর কারণে অকারণে দাঁত বের করে হাসা ছাড়া ওর আর কোন কোয়ালিফিকেসন আছে নাকি ?

বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ আমার কপালে মারলে এক ঘুশি বটব্যাল। ব্যাটার হাতে ছিলো প্রকাণ্ড একটা হীরের আংটি। সেটা

ঢুকে গেল কপালে—ফিনকি দিয়ে রক্ত পড়তে লাগলো। আমিও ঘুশি বাগিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছি—কোথা থেকে দুতিনটে চাকর এসে জোর করে আমায় টানতে টানতে বাইরে রাস্তায় এনে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলে...

আবার ঝিমিয়ে পড়ে প্রশান্ত। কলাইয়ের বাটিটা লাল হয়ে গেছে। সেই দিকে চেয়ে বসে থাকে সুমিতা। কুলুঙ্গির ভেতরে ছোট্ট টাইম পিসটা ক্ষীণ কণ্ঠে টিক টিক আওয়াজ করে চলে। হালকা হাসির সঙ্গে প্রশান্তর কথা কানে আসে—অয়ি পতিব্রতে! তোমার সেবায় আজ আমি পরিতুষ্ট হয়েছি, যাহা ইচ্ছা বর চেয়ে নাও। তারপর সাপের মত প্রশান্তর হাতখানা সুমিতার কোমরটা পেঁচিয়ে ধরে আস্তে আস্তে কাছে টানতে শুরু করে। দু একবার বাধা দেবার চেষ্টা করে সুমিতা, পারে না—শেষকালে হাল ছেড়ে দেয়।

জ্বরের ঘোরে না ক্ষিদেয় একটানা কেঁদেই চলে আট মাসের মেয়েটা।

অসমাপ্ত

দক্ষিণের বারান্দায় নির্দ্দিষ্ট একটা জায়গায় দাঁড়ালে পরিষ্কার দেখা যায় আঁকা বাঁকা গলিটা ছাড়িয়ে বড় রাস্তার ট্রাম ষ্টপেজটা। নামছে যত লোক, ঠেলাঠেলি করে উঠছে তার চেয়ে অনেক বেশি। স্ত্রী পুরুষের ভেদাভেদ নেই, গাদাগাদি ঠাশাঠাশি করে যাওয়ার তাগিদে সবাই উন্মাদ। বাইরে পাদানির ওপর কোনও রকমে একখানা পা রেখে রড ধরে বাদুড়ের মত ঝুলতে ঝুলতে চলেছে—যেন জীবন পাত্র কানায় কানায় ভরতি হয়ে উপছে পড়ছে। বারান্দার রেলিংটার ওপর সেদিনের দৈনিক কাগজটা দলামলা করে মুড়ে হাতে নিয়ে ঝুঁকে পড়ে অভীজিৎ অবাক হয়ে বড় রাস্তার এই কর্ম্মব্যস্ত জীবন প্রবাহের দিকে চেয়েছিল। আফিস টাইম, ট্রামের পর ট্রাম আসছে যাচ্ছে, বেশীক্ষণ চেয়ে থাকলে একঘেয়ে বৈচিত্রহীন লাগে। হঠাৎ অভীজিৎ সোজা হয়ে দাঁড়াল—দৃষ্টি প্রখর। ট্রাম ষ্টপেজে যাত্রী বোঝাই একখানি ট্রাম এসে দাঁড়াতেই অনেকগুলো লোক হুড়মুড় করে নেমে রাস্তায় দাঁড়ালো। সবার দৃষ্টি ট্রামটার ভেতরে —যেন কার নামবার পথ সুগম করে দেবার জন্যেই ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। একটু পরেই সবার উৎসুক তীক্ষ্ণ দৃষ্টির ভেতর দিয়ে নামলো একটি তরুণী মেয়ে। কর্ম্মব্যস্ত জীবনের গতি যেন মুহূর্ত্তের জন্যে একটু থেমে গেল। ঘণ্টা দিয়ে ট্রাম ছেড়ে দিতেই লজ্জা পেয়েই ওরা দৌড়ে আবার উঠে পড়ে। মেয়েটি দাঁড়িয়ে চারপাশে একবার চেয়ে নেয়, যেন কিছু খোঁজে—হঠাৎ ওর দৃষ্টি গলিটার ওপর পড়তেই চলতে সুরু করে। অভীজিৎ একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। মেয়েটি গলির বাঁকে অদৃশ্য হয়ে আবার একটু পরে ধীর মন্থর গমনে সামনে এগিয়ে আসে। অপূর্ব্ব সুন্দরী মেয়ে, বয়েস কুড়ি একুশের বেশী হবে না। চাঁপা ফুলের মত রং, নিখুঁৎ চোখ নাক মুখ—ছিপছিপে

লম্বা গড়ন। পরণে পাতলা গুজরাটি ছাপা শাড়ী আর তারই সঙ্গে ম্যাচ্ করিয়ে ব্লাউজ। সবচেয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে ওর মাথার চুল। কুচকুচে কালো নয়, আবার ফ্যাকফেকে কটা নয়। তেলের চাকচিক্য নেই, আবার না মাথার রুক্ষতাও নেই। এ যেন কালো আর সোনালি রং ত্বটো চুলের মধ্যে লুকোচুরি খেলছে। মাঝখানে সিঁথি, খোলা চুল—আঁচড়ে পেছনে ফ্যালা। পুরোপুরি ববও নয় আবার আজানুলম্বিতও নয়। একটু দূর থেকে মনে হয় এক সঙ্গে কতকগুলো সর্প শিশুকে মাথার ওপর থেকে পিঠে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে, সামান্য একটু হাওয়া লাগলে কিংবা একটু নড়লে চড়লেই ওগুলো মাথা নেড়ে খেলা করতে শুরু করে দেয়। দূর থেকে মুখখানা মেকআপ মনে হয়, কাছে এলে দেখা যায়—পাউডার লিপষ্টিক কিছু নয়—ঠোঁটের স্বাভাবিক রংই গোলাপী। পিটের ওপর ঝোলানো একটা ক্যাম্বিসের না প্লাসটিকের মাঝারি ব্যাগ—হাতে ছোট্ট একটা ভ্যানিটি ব্যাগ। অবাক হয়ে অভীজিৎ ছাখে মেয়েটি সোজা এগিয়ে আসছে এই বাড়ীটার দিকে। কেমন একটা অস্বোয়াস্তি অনুভব করে অভীজিৎ—আশেপাশে চেয়ে ছাখে অনেকেই লক্ষ্য করেছে মেয়েটিকে। জানালা দরজায় ভিড় করে মেয়েপুরুষ দাঁড়িয়ে এই বাড়ীটার দিকে চেয়ে নানা জল্পনা কল্পনা শুরু করে দিয়েছে। লজ্জা পেয়ে তাড়াতাড়ি সরে আসে অভীজিৎ, তারপর চেয়ারটা টেনে এনে বারান্দার মাঝখানে গোল টেবিলটার পাশে বসে পড়ে।

একটু পরেই বহুদিনের পুরোনো হিন্দুস্থানী ঠাকুর রঘুনন্দন পাঁড়ে ওপরে এসে বলে—একঠো মাইজী মুলাকাত করতে আইয়েছে বাবু।

অজ্ঞতার ভান করে অভীজিৎ,—মাইজী? আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়?

—জী!

—নীচের ঘরে বসতে বলো। তখনই আবার কি ভেবে বলে—নেহি, উপর ভেজ দো।

সিঁড়িতে খট খট জুতোর আওয়াজ শোনা যায়, অভীজিতের বুকের ভেতর টিপ টিপ করতে থাকে। হাসি মুখে হাত তুলে কাছে এসে নমস্কার করে মেয়েটি, তারপর জিজ্ঞাসা করে—আপনিই তো অভীজিৎ রায়?

ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায় অভীজিৎ।

হেসে ফেলে মেয়েটি। মুক্তোর মত সাজানো ঝকঝকে দাঁতগুলো হাসলে আরও সুন্দর দেখায়। অভীজিৎ আড়ষ্ট হয়ে ভাবে, তার নামটার মধ্যে হাসবার উপাদান কি থাকতে পারে।

হাসতে হাসতেই বলে মেয়েটি—একজন ভদ্রমহিলাকে বসতে বলার ভদ্রতাটুকুও আপনার নেই দেখে ভারি দুঃখু পেলাম ডাক্তারবাবু।

—ডাক্তারবাবু! অবাক হয়ে ভাবে অভীজিৎ নিশ্চয় লোক ভুল করেছে মেয়েটি। নিজেই একখানা চেয়ার টেনে বসে পড়ে মেয়েটি। তারপর কাঁধের ঝোলানো ব্যাগটা নামিয়ে রাখে চেয়ারের পাশে।

অভীজিৎ বলে—ডাক্তার! হঠাৎ আমাকে ডাক্তার বলে মনে হওয়ার কারণটা তো বুঝলাম না!

এবার অবাক হয় মেয়েটি। একটু শঙ্কাভরে জিজ্ঞাসা করে,—বাইরে যে নেম প্লেটটি দেখলাম, ওটা আপনার কি?

অভীজিৎ বলে—হ্যাঁ।

আবার খানিকটা হেসে নেয় মেয়েটি। তারপর বলে—অভীজিৎ রায় এম, বি, এটা দেখে আপনাকে ডাক্তার মনে হওয়ায় খুব ভুল হয়েছে কি?

উত্তেজিত হয়ে বলে অভীজিৎ—ওটা আপনার দেখবার ভুল—ভাল করে দেখলে দেখতেন লেখা আছে এম-এ, বি-এল।

মেয়েটি বলে তাহলে একটু কষ্ট করে নিজে একবার দেখে আসুন।

তাড়াতাড়ি নিচে নেমে যায় অভীজিৎ। বাইরের দরজার পাশে নেম প্লেটটায় সবিস্ময়ে ছাখে অভীজিৎ নামের পাশে লেখা আছে এম, বি। এম-এ, বি-এল এর এ আর এল-টা কালো কালি দিয়ে কে যেন দুষ্টুমী করে চেপে দিয়েছে। মনে মনে, পাড়ার দুষ্টু

ছেলেদের মুণ্ডপাৎ করতে করতে ওপরে উঠে আসে অভীজিৎ। ওপরে এসেই ছাখে এরই মধ্যে মেয়েটি উঠে বারান্দার দেওয়ালে টাঙানো ছবিগুলো ঘুরে ঘুরে দেখতে সুরু করে দিয়েছে। অভীজিতের দিকে না চেয়েই মেয়েটী বললে—এবার বিশ্বাস হয়েছে? আঙ্গুল দিয়ে একটা ফটোর দিকে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করে মেয়েটী—এটা কার ছবি বলুন তো?

মনে মনে একটু বিরক্ত হয়েই অভীজিৎ বলে আমার স্ত্রীর।

ফিরে তাকায় মেয়েটী অভীজিতের দিকে। তারপর কাছে এসে বলে—ডাকুন না একবার, আলাপ করে যাই।

অভীজিৎ বলে—উনি এখানে নেই, আজ ক'দিন হল বাপের বাড়ী গেছেন।

একটু বিস্মিত হয়েই যেন মেয়েটী বলে—ওঃ তাই! তারপর চেয়ারটায় বসে এক দৃষ্টে চেয়ে থাকে অভীজিতের দিকে।

অসহিষ্ণু হয়ে অভীজিৎ বলে—তাই কি?

একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে মেয়েটি বলে—কিছুনা। তারপর যেন নিজের মনেই বলতে থাকে—বাইরে থেকে শুধু চেহারা দেখে পুরুষ মানুষকে বিচার করতে গেলে প্রায়ই ঠকতে হয়—আজ সেটা স্পষ্ট বুঝতে পারলাম।

রাগে সর্ব্বাঙ্গ জ্বালা করে ওঠে অভীজিতের, কথা খুঁজে পায় না—চুপ করে থাকে।

মেয়েটী বলে—মাফ করবেন, এই আপনার কথাই ধরুন না—প্রথমে আমার মনে হয়েছিল সাদাসিদে ভাল মানুষ—কিন্তু যতই পরিচয় পাচ্ছি অবাক হয়ে যাচ্ছি।

অভীজিৎ ধৈর্য্যের শেষ সীমায় পৌছে গেলেও শান্তকণ্ঠে বলে, কি পরিচয় পেলেন?

মেয়েটী বলে—আপনার কথাই মেনে নিলাম—আপনি উকিল, কিন্তু স্ত্রীর অনুপস্থিতে ইচ্ছে করে আদালতে না গিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে পাড়ার মেয়েদের ছাখা, খুব ভদ্ররুচির পরিচয় যে নয় এটা বুঝতে মোটেই কষ্ট হয় না।

সশব্দে চেয়ারখানা ঠেলে উঠে দাঁড়ায় অভীজিৎ, তারপর রাগে কাঁপতে কাঁপতে বলে—ঢের সহ্য করিছি আপনাকে, আর নয়। আপনার স্পর্দ্ধা দেখে আমি এতক্ষণ অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। জানি না কে আপনি—আর কি উদ্দেশ্যে এখানে এসেছেন। যাই হোক এবার আপনি দয়া করে যেতে পারেন।

আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়িয়ে মেয়েটী বলে—এও আপনার চরিত্রের আর একটী বিস্ময়কর প্রকাশ, এই একটুতেই ধৈর্য্য হারিয়ে ফেলা। ট্রাম থেকে নেমেই আপনাকে প্রথম দেখতে পাই—মনে হয়েছিল ধীর স্থির—বুদ্ধিমান, কিন্তু এখন দেখছি সব উলটো। দয়া করে বাইরে চেয়ে দেখুন।

বাইরে চেয়ে লজ্জায় সঙ্কোচে এতটুকু হয়ে যায় অভীজিৎ। পাড়ার সব জানালায় ছাতে অগুন্তি কৌতুহলি নর-নারীর ভিড়। সবার লক্ষ্য এই বাড়ীটী।

মাথা নীচু করে বসে পড়ে অভীজিৎ। মেয়েটী তেমনি দাঁড়িয়ে থাকে চুপ করে। একটু পরে বলতে সুরু করে—এইবার আমার পরিচয় রহস্যটা ক্লিয়ার করে দিচ্ছি শুনুন,'আমার নাম মিস বিলুপ্তি সেন, পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেণ্টের অধীনে পল্লী উন্নয়নের কাজ করি। আমি আর্টিষ্ট—

সভয়ে চোখ তুলে তাকায় অভীজিৎ।

মনের ভাব বুঝতে পেরেই তাড়াতাড়ি বলে মেয়েটী—ভয় নেই, সিনেমা আর্টিষ্ট নই—আমি শিল্পী, মানে ছবি আঁকা আর্টিষ্ট। এক একটা পল্লীর বা পুরোনো পাড়ার স্কেচ্ এঁকে আফিসে দিয়ে দিই—মাইনে পাই—।

বাধা দিয়ে অভীজিৎ বলে—আর আমাকে লজ্জা দেবেন না, সত্যিই ও ভাবে ধৈর্য্য হারিয়ে ফেলাটা আমার খুব অন্যায় হয়ে গেছে। কি জানেন, শরীরটা আজ কদিন ধরে ভাল যাচ্ছে না, মনটাও খারাপ, সেই জন্যে—।

হাল্কা হাসিতে মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে মেয়েটীর। চেয়ারে

বসে বলে—থাক থাক—অত করে বলতে হবে না আপনাকে—এক কথায়—'সেই সীতা হারা হয়ে এ দুর্দ্দশা তব।' দুজনে এক সঙ্গে হেসে উঠে। চেয়ারের পাশে রাখা প্লাসটীকের ব্যাগটা থেকে একখানা চৌকো মোটা কাগজ আর একটা পেনসিল বার করে মিস সেন, তারপর সেটা টেবিলের ওপর ফ্ল্যাট করে পেতে বলে—'আপনার এই বারান্দা থেকে এ পাড়ার ভিউটা চমৎকার, এখান থেকে সবগুলো বস্তি-বাড়ী স্পষ্ট দেখা যায়—তাইতো ট্রাম থেকে নেমে আপনাকে দেখে তখনই প্লানটা ঠিক করে ফেললাম।

অভীজিৎ হেসে বলে—সব কিছুই আপনার অদ্ভুত, বিশেষ করে নামটা, এ রকম পিকিউলিয়র নাম আগে শুনিনি।

ভ্যানিটী ব্যাগটার ভেতর থেকে ছোট্ট একখানা ছুরি বের করে পেনসিলটা বাড়তে বাড়তে মিস সেন বলে—সেই জন্যেই তো, আমি চাইনে আমার নেম সেক আর কেউ থাকে। ওদিক থেকে আমি ভীষণ স্বার্থপর—অন্ততঃ নামের দিক থেকে আমি হতে চাই, একমেবাদ্বিতীয়ম। পেনসিল কাটা শেষ করে চেয়ার থেকে উঠে বারান্দায় রেলিংএ ভর দিয়ে চার পাশে শিল্পীর চোখ বোলাতে বোলাতে মিস সেন বলে—বিউটিফুল! অভীজিতের দিকে ফিরে বলে—কিছু মনে না করেন তো একটা কথা বলি।

অভীজিৎ বলে—মনে কোরবো না বলুন।

মিস সেন—স্কেচটা শেষ করতে আমার দিন চারেক লাগবে—এই চারটা দিন আপনাকে একটু কষ্ট দোব—অবশ্যি যদি আপনার আপত্তি থাকে—। অভীজিৎ মনে মনে হয়তো একটু ভয় পায়। মুখে বলে—না না অসুবিধে আর কি। তবে কাল থেকে আমি কোর্টে বেরুবো ভাবছি—তা আমার ঠাকুর রঘু থাকবে—তাকে বলে যাবো, আপনার কোন অসুবিধা হবে না।

দুষ্টুমি করবার লোভ সামলাতে পারে না মিস সেন, বলে—এই বললেন শরীর ভাল না, আবার বলছেন কাল থেকে কোর্টে যাবেন—আমার ভয়ে নাকি? দেখুন আমি সত্যি কথা, তা সে যত অপ্রিয়

হোক, বলতে ভালবাসি।—উকিল হিসাবে আপনার যা পসার প্রতিপত্তি দেখছি তাতে সারাদিন বটতলায় ঘুরে বেড়ানোর চেয়ে বাড়ীতে বসে বিশ্রাম করাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। কথা শেষ করে খিল খিল করে হেসে ওঠে মিস সেন। প্রতিবাদ করে ঝগড়া করতে সাহস পায় না অভীজিৎ, চুপ করে থাকে। টেবিলে পাতা সাদা কাগজটার ওপর ঝুকে পড়ে পেন্সিল দিয়ে নক্‌সা করতে শুরু করে মিস সেন। অভীজিৎ উঠে নীচে নেমে যায় চায়ের ব্যবস্থা করতে।

একটু পরে ওপরে এসে অবাক হয়ে যায় অভীজিৎ। টেবিলের ওপর হিজিবিজি কাটা সাদা কাগজটা শুধু পড়ে আছে—মিস সেন নেই। বিস্মিত ও শঙ্কিত হয়ে চারদিক দেখতে থাকে অভীজিৎ—শোবার ঘর থেকে মিস সেনের গলা শোনা যায়—আমি এই ঘরে মিঃ রায়, ভীষণ তেষ্টা পেয়ে ছিল তাই জলের সন্ধানে এসেছি।

রাগে ফুলতে ফুলতে এক রকম ছুটে গিয়ে দাঁড়ায় অভীজিৎ পাশের শোবার ঘরটার দরজায়। মিস সেন তখন খাটের পাশে রাখা বুক সেল্‌ফটার কাছে দাঁড়িয়ে এলোমেলো বই গুলো গুছিয়ে রাখছে।

প্রতিবাদ করবার ভাষা খুঁজে পায় না অভীজিৎ। মিস্ সেন বলে যায়—মনে মনে বেশ জানেন যে এই স্ত্রী জাতটাকে বাদ দিয়ে আপনাদের এক পা বাড়াবার ক্ষমতা নেই তবু মুখে কিছুতেই স্বীকার করবেন না—দেখুন তো, মাত্র কয়েকটি দিন স্ত্রীর অনুপস্থিতিতে ঘরটির অবস্থা কি করেছেন। হঠাৎ বিছানাটার দিকে হাত দিয়ে দেখিয়ে মিস সেন বলে—চেয়ে দেখুন তো বিছানাটার অবস্থা, এ রকম বিছানায় মানুষ যে কি করে শোয় আমি তো ভাবতেও পারি না, আস্তাকুড়ও এর চেয়ে পরিষ্কার।

অভীজিতের ইচ্ছে হচ্ছিল চীৎকার করে বলে—এর জন্যে আপনারই বা এত মাথাব্যথা কেন? কিছু না বলে রুদ্ধ আক্রোশে ফুলতে থাকে অভীজিৎ। বিছানার চাদরটা ঠিক করে পাততে

পাত্তে ছোট ছেলের একটা রঙীন সিল্কের জামা হাতে করে অভীজিতকে প্রশ্ন করে মিস সেন—ছেলেপিলেও আছে নাকি?

নিতান্ত অনিচ্ছায় জবাব ছ্যায় অভীজিৎ—হ্যাঁ, একটি ছেলে।

—বয়স কত?

—তিন বছর।

জামাটা বিছানার উপর রেখে ঝুপ করে খাটের এক পাশে বসে পড়ে মাথার বালিস ঠিক করতে সুরু করে মিস সেন। বালিসের তলায় দেখা যায় একখানা অসমাপ্ত চিঠি। টেনে বার করে পরম কৌতুকে পড়তে সুরু করে—'প্রাণের রমা,'—এইটুকু পড়েই হাসিতে ফেটে পড়ে মিস সেন, বলে—আপনি হাসালেন মিঃ রায়, ছেলের বয়েস তিন বছর এখনও 'প্রাণের রমা'? কোথায় লিখবেন 'কল্যাণীয়া রমা'—তা নয়—। ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙে চুরমার হয়ে যায়, বাঘের মত লাফিয়ে পড়ে মিস সেনের হাত থেকে চিঠিটা কেড়ে নেবার চেষ্টা করে অভীজিৎ—ধ্বস্তাধ্বস্তি করতে করতে ছুজনে জড়াজড়ি করে পড়ে যায় খাটের ওপর। ঠিক এমনি সময় শোনা যায় বারান্দা থেকে কে যেন ডাকতে ডাকতে এগিয়ে আসছে—'কই অভী এখনও শুয়ে আছ, ব্যাপার—' হঠাৎ থেমে যায় কথা। অভীজিৎ ঐ অবস্থায় অসহায় চোখ মেলে ছাখে—দরজার সামনে বিস্ময়ে চোখ ছুটো বিস্ফারিত করে দাঁড়িয়ে আছে বড় শ্যালক রামচন্দ্র। কয়েক মুহূর্ত্ত, পরক্ষণেই যাবার জন্য ফিরে দাঁড়ায় রামচন্দ্র—একটু ইতস্ততঃ করে বলে,—মাফ করো ভাই অভী, আমি জানতাম তুমি একাই আছ, তাই খবর না দিয়ে সটান ওপরে চলে এসেছি। শুনেছিলাম তোমার কলিক পেনটা আবার বেড়েছে। রমা বারবার বলে দিয়েছিল আফিস যাবার পথে তোমায় একবার দেখে যেতে, তা—দেখেই গেলাম। কথা শেষ করেই জোরে পা চালিয়ে নীচে নামতে শুরু করে রামচন্দ্র। অভীজিতের যেন বাক্‌শক্তি লোপ পেয়ে গেছে—কথা বলার চেষ্টা করে, আওয়াজ বেরোয় না—শুধু কণ্ঠনালীটা বার কতক নড়ে ওঠে। হঠাৎ নজরে পড়ে

মিস সেনের চিঠি শুদ্ধ হাতখানা তখনও ধরে আছে—রাগে ছুঁড়ে ফেলে ছ্যায় হাতখানা। তারপর ছুটে গিয়ে বারান্দার রেলিং ধরে দাঁড়ায়, ছ্যাখে সদর দরজা পার হয়ে রামচন্দ্র গলিতে পড়েছে। ঝুঁকে পড়ে চীৎকার করে বলে—বড়দা একবারটি শুনে যাও, তুমি যা দেখেছ সব ভুল,—বড়দা—

কোনও জবাব না দিয়ে দ্রুত পা চালিয়ে গলি পেরিয়ে বড় রাস্তায় অদৃশ্য হয়ে যায় রামচন্দ্র।

ক্ষোভে দুঃখে অপমানে অভীজিতের তখন কেঁদে ফেলার অবস্থা। ফিরে ছ্যাখে হাত দুই দূরে বিমর্ষ মুখে দাঁড়িয়ে আছে মিস সেন। কষ্টে নিজেকে সংযত করে হাত জোড় করে অভিজীৎ বলে—আশা করি আপনার মনস্কামনা পূর্ণ হয়েছে, এবার দয়া করে আমাকে রেহাই দিন, আপনি যান।

—আমায় বিশ্বাস করুন মিঃ রায়, এতখানি ক্ষতি আপনার হবে আমি ভাবতেও পারিনি। উন্মাদের মত হেসে অভীজিৎ বলে—ক্ষতি? আমার সারা জীবনটা মরুভূমি করে দিয়ে ভাবছেন তুচ্ছ ক্ষতির কথা। আপনার নামের সার্থকতা এতক্ষণে বুঝলাম—যেখানে আপনি যাবেন—কিছুর অস্তিত্ব বিলুপ্ত করে দেওয়াই হচ্ছে আপনার একমাত্র কাজ।

বিলুপ্তি সেন! মোষ্ট বিফিটিং। হঠাৎ হিষ্টিরিয়ার রোগীর মত হাসতে শুরু করে অভীজিৎ তারপর অবসন্ন হয়ে বসে পড়ে—মনে হয় কলিক পেনটা যেন দ্বিগুণ বেড়ে গেছে। যন্ত্রনায় মুখ বিকৃত করে কোনও রকমে টলতে টলতে ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ে অভীজিৎ।

* * * *

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙে একটা ট্যাক্সির বিকট হর্ণের আওয়াজে। ঘড়ির দিকে চেয়ে ছ্যাখে বেলা নটা। তাড়াতাড়ি উঠে বারান্দায় এসে বসে অভীজিৎ, গতদিনের ঘটনাগুলো স্বপ্ন বলেই মনে হয়, সিঁড়িতে অনেকগুলো পায়ের শব্দ শোনা যায়, চেয়ে ছ্যাখে আগে রমা, কোলে তিন বছরের ছেলে পেনটু, পেছনে বড় শালা রামচন্দ্র, তার পেছনে মস্ত একটা স্যুটকেস ঘাড়ে রঘু নন্দন পাঁড়ে, তারও পেছনে ও কি! আতঙ্কে

শিউরে উঠে অভীজিৎ। গ্যাখে সবার পেছনে কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে অপরাধীর মত গুটি গুটি ওপরে উঠছে সমস্ত সর্ব্বনাশের মুলাধার বিলুপ্তি সেন। রামচন্দ্রই আগে কথা বলে—রমা বোঝাপড়া যা করবার নিজেরাই করে নাও। আমায় জালিয়ো না তাহলে কালকের মত আজও অফিসে লেট হয়ে যাবে। কোন উত্তরের অপেক্ষা না করেই তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে নেমে যায় রামচন্দ্র, স্যুটকেসটা রেখে মাইজীর কোল থেকে পেনটুকে নিয়ে আদর করতে করতে নীচে নেমে যায় রঘুনন্দন পাঁড়ে।

রমা বলে কেমন আছ?

উত্তর না দিয়ে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে অভীজিৎ বিলুপ্তি সেনের দিকে। লজ্জানত মুখে আস্তে আস্তে এগিয়ে আসে মিস সেন। তারপর হঠাৎ ঝপ করে একটা প্রণাম করে অভীজিৎকে। আড়ষ্ট হয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে অভীজিৎ। রমা হেসে ফেলে বলে—তোমার ঘটে কি একটুও বুদ্ধি নেই? ওকে চিনতে পারলে না? ও আমাদের বিল্লি, মামীমার একমাত্র আদরিনী মেয়ে।

কালো মেঘলা আকাশে ক্ষণিক বিদ্যুতের ঝিলিক, বুঝতে পারে না অভীজিৎ, চুপ করে থাকে। এবার কথা বলে বিল্লি—রমাদি তোমারই কি বুদ্ধি, জামাই বাবু কি আমায় কোনও দিন দেখেছেন, যে চিনতে পারবেন? তোমাদের বিয়ের তিন মাস আগে আমি বিলেত চলে যাই সেটা একদম ভুলে গেছ?

নিজের ভুল বুঝতে পেরে রমা বলে—সত্যিই তো আমার খেয়ালই ছিল না। ছেলে বেলায় ও বেড়ালের মত দুষ্টু ছিল তাই সবাই ঐ নামে ডাকতো। তারপর অঙ্কন বিদ্যা শিখতে বিলেত যাবার আগে নিজেই নাম পালটে বিলি সেন করে নিলে। ফিরে এসে বললে—রমাদি বিলি নামটার বিলিতি গন্ধ একটু আছে—ওটাকে বিলুপ্ত করে নিলে কেমন হয়? বললাম তথাস্তু।

অভীজিৎ বলে—সবই বুঝলাম—কিন্তু কালকের ঘটনাটা এখনও রহস্যে ঢাকা আছে। রমাই উত্তর দিলে—গ্যাখো কালকের ব্যাপরটায়

আমারও খানিকটা দোষ আছে। বিল্লি বললে পুরুষ মানুষকে কখনও বিশ্বাস করতে নেই—সুযোগ সুবিধে পেলেই ওরা সেটার সদ্ব্যবহার কোরবেই, আমি বললাম—কখনই নয়, তারপর তোমাকে নিয়ে বাজী। বিল্লি—কিন্তু রমাদি, কথা ছিল—চার দিন চার রাতের মধ্যে আমি যদি প্রমাণ দিতে না পারি তবেই বাজী হারবো—।

রাগের ভান করে রমা—এক দিনের ধাক্কা সামলাতেই প্রাণান্ত আবার চার দিন।

বিল্লি বলে—তাহলে স্বীকার কর হেরে গেছ ?

মেঘলা আকাশ পরিষ্কার হয়ে যায়। একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে উঠে গিয়ে ঘরের ভেতর থেকে একটা সাদা পুরু কাগজ নিয়ে আসে অভীজিৎ—সেটা খুললে দেখা যায় গত দিনের পেনসিলের হিজিবিজি কাটা অসমাপ্ত নক্সাটা। সামনে মেলে ধরে অভীজিৎ জিজ্ঞাসা করে—এই আন-ফিনিসট্ স্কেচটা কি ভুলে রেখে গিয়ে ছিলে না ইচ্ছে করেই—।

অম্লান বদনে বিল্লি বলে—ইচ্ছে করেই।

বিস্মিত হয়ে অভীজিৎ বলে—কারণ ?

হেসে বিল্লি বলে—দেখুন জামাইবাবু! আপনি সত্যিই উকিল কিনা সে বিষয়ে আমার এখনও যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। এই সহজ ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন না ? ওটা রেখে যাওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে—যত্ন করে ওটাকে বাঁধিয়ে সামনে টাঙিয়ে রেখে দেবেন—ভবিষ্যতে রমাদির অনুপস্থিতিতে যদি আবার কোনও সুন্দরী মেয়ের খপ্পরে পড়েন—ওটার দিকে নজর পড়িলেই সহজেই নিস্তার পেয়ে যাবেন,—বুঝেছেন ?

রমা ও বিল্লি এক সঙ্গে হেসে ওঠে, শুধু প্রাণ-খুলে সে হাসিতে যোগ দিতে পারে না —বেচারা অভীজিৎ।

নাটকীয়

বাইরে ঝমঝমে বৃষ্টি সেই সঙ্গে মাঘের কনকনে শীত।

গদাইদার বাইরের ঘরে আপাদমস্তক র‍্যাপার মুড়ি দিয়ে আড্ডা দিচ্ছিলাম আমরা। আলোচনা হচ্ছিল নাটক নিয়ে, শীতলদা বল্‌লেন,—সত্যিকার জাত নাটক বলতে আমি বুঝি পৌরাণিক আর ঐতিহাসিক। আর সব যা-তা, না-টক্, না-মিষ্টি, খানিকটা ঝাল আছে হয়তো।

চড়া নিখাদে বাঁধা একঘেয়ে খনখনে গলায় প্রণব বললে,—কেন? আজ কাল যে নৃত্য নাটকগুলো হচ্ছে সেগুলো কি অপরাধ করলে?

চা এসে গেল। সবাই নড়ে চড়ে উঠে বসল।

গদাইদা বললেন,—তোমার মতামতটা তো জানতে পারলাম না ভাই।

চায়ের কাপটা নামিয়ে অপরাধীর মত বললাম,—আমার মতামতের সঙ্গে এদের কারও মিল নেই—কাজেই নির্ব্বাক শ্রোতার ভূমিকাই আমার পক্ষে নিরাপদ।

সবাই ধরে বসল—আমার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা এ সম্বন্ধে কী বলে শোনাতে হবে।

বললাম,—তাহলে বলব, নাটক কোনও গণ্ডি বা কালের সীমার মধ্যে আটকে নেই। মানুষ যতদিন বেঁচে থাকবে—নাটক ছায়ার মত ঘিরে থাকবে তাকে—এক কথায় আমাদের সারা জীবনটাই একটা নাটক।

খুব সত্যি কথা। সবাই চমকে ফিরে চাইলাম। দরজার কাছে আধভিজে হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন হরি খুড়ো।

গদাইদা উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—আজ কী ভাগ্যি আমাদের, হরি খুড়োর পায়ের ধুলো পড়ল এখানে। বোসো খুড়ো।

হরি খুড়ো ইউনিভারস্যাল খুড়ো। গদাইদা ডাকেন হরি খুড়ো, তাঁর ছেলেরা ডাকে হরি খুড়ো—তাদের ছেলেরা—। আমরাও ছেলেবেলা থেকেই ঐ নামেই ডাকি—খুড়োর পদবী পর্যন্ত অনেকে জানে না। বয়েস অনুমান করা শক্ত। ষাট থেকে সাতাশি, কোনটাই বেমানান হবে না।

খুড়ো কিন্তু বসলেন না, গদাইদার কাছে গিয়ে চুপি চুপি কী একটা কথা বলে পাশের ছোট ঘরটায় ঢুকে পড়লেন।

ব্যাপারটা বুঝতে বাকি রইল না আমাদের। খুড়োর আফিম ফুরিয়েছে—তাই শীত বৃষ্টি উপেক্ষা করে ছুটে এসেছেন।

নিজে কোনও রকম নেশা না করেও সব নেশাখোরের অকৃত্রিম দরদী ও মরমী বন্ধু গদাইদা। তখনই একটা চাকরকে ডেকে কি একটা বলতেই—সে ছাতা নিয়ে বেরিয়ে গেল।

আমাদের দিকে চেয়ে গদাইদা বললেন—একটু বস ভাই, আসছি। বলেই পাশের ঘরে খুড়োর কাছে চলে গেলেন।

আলোচনা আমাদের গুঞ্জনে পরিণত হল। নাটক থেকে আলোচনার বিষয় বস্তু হয়ে দাঁড়াল হরি খুড়ো। শীতলদা বললেন—তোমরা হয়তো জাননা—যেবার শতকরা বারোজন পাশ করে, খুড়ো সেই বছর বি, এ, পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন।

একজন নবাগত প্রৌঢ় ভদ্রলোক মুখ থেকে র‍্যাপারটা সরিয়ে বললেন,—এই কলকাতায় খুড়োর সাত আট খানা বাড়ি গাড়ি সবই ছিল। তখনকার দিনে একমাত্র নাম করা কনট্রাকটার বলতে খুড়োকেই বোঝাতো।

বাঁশি বেজে উঠল প্রণবের গলায়—গেল কিসে?

ঘরে ঢুকতে ঢুকতে জবাব দিলেন গদাইদা, বললেন—কৃতবিদ্য হয়ে পর পর দুটি ছেলে মারা যাবার পর খুড়ো মদ ধরলেন, খুড়িমা মারা যাবার পর বছর সাতেকের মধ্যেই জুয়ো মেয়েমানুষ আরও রং-বেরঙের উপসর্গে একে একে বাড়ি গাড়ি সব গেল! কেউ জিজ্ঞেস করলে খুড়ো বলতেন—আমার জীবনের ওপর দিয়েই উত্থান পতন সব কিছু

হয়ে যাক—। সব শেষ হয়ে গেলে খুড়ো আফিং ধরলেন। সেও এক মর্ম্মান্তিত নাটকীয় ঘটনা—আর একদিন বলবো। এই যে খুড়ো! এস এস—চা দিয়েছে তোমায়?

চাকর এক কাপ চা এনে খুড়োর হাতে দিল। পরম তৃপ্তির সঙ্গে পেয়ালাটি শেষ করে আরামের নিঃশ্বাস ফেললেন খুড়ো।

নিস্তব্ধ ঘর, সবাই চুপ করে আছি।

খুড়ো বললেন,—নাটক নিয়ে কি তর্ক হচ্ছিল তোমাদের?

গদাইদা আমায় দেখিয়ে বললেন,—ইনি বলছিলেন নাটক খুঁজতে ইতিহাস-পুরাণের পাতা উল্টাবার দরকার নেই—মানুষের জীবনেই রয়েছে নাটকের সব কটা উপাদান। চোখ বুজে খুড়ো বললেন,—খুব সত্যি কথা! আমার জীবনের একটা ঘটনা বললেই বুঝতে পারবে কথাটা কতখানি সত্যি।

সবাই উৎগ্রীব হয়ে বসলাম। খুড়ো বলতে শুরু করলেন।

—তখন আমি বেশ নাম করা বিলডিং কনট্রাকটার। বর্দ্ধমানে একটা স্কুল বাড়ির কনট্রাক্ট করে প্রায় হাজার পাঁচেক নগদ টাকা সঙ্গে নিয়ে—পুরোণো মডেলের ঝরঝরে ফোর্ড গাড়িটায় কলকাতায় ফিরছিলাম। ওখানকার কাজ শেষ করে রওনা হতে প্রায় সন্ধ্যে সাতটা বেজে গেল। বন্ধু বান্ধব সবাই নিষেধ করলো—অত টাকা সঙ্গে নিয়ে একা রাতে কলকাতায় নাই বা গেলে, কাল সকালে রওনা হোয়ো। ছেলেবেলা থেকে একগুঁয়ে বদনাম—কারও কথাই শুনলাম না।

পানাগড় পার হতে না হতেই মুষলধারে বৃষ্টি নামল সেই সঙ্গে ঝড়ো হাওয়া। টুরার গাড়ি, ওপরের ছাওনিটাও জায়গায় জায়গায় ছেঁড়া—মিনিট খানেকের মধ্যেই ভিজে গেলাম। গাড়িটা আমার বহু আপদ বিপদের সাথী—কোনও দিন বিশ্বাসঘাতকতা করেনি, আজও করল না—আস্তে কখনও জোরে চালিয়ে শ্রীরামপুর যখন পৌঁছলাম তখন রাত বারোটা বেজে গেছে। দোকানপাট সব বন্ধ। খিদেয় পেট চোঁ-চোঁ করেছে—অন্ততঃ এক কাপ গরম চা পেলেও বেঁচে যাই।

ঝড় বৃষ্টি যা একটু থেমে এসেছিল আবার পুরোদমে শুরু হল। কি করি, আবার গাড়িতে উঠে বসলাম। ভাবলাম এইভাবে বসে ভেজার চেয়ে আস্তে আস্তে এগুলে এক সময় বাড়ি পৌঁছে যাবই। ষ্টার্ট আর হয় না। মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল, বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে ব্যাটারি একদম খতম, নয়তো সিলেণ্ডারে জল ঢুকেছে। ভাল মোটর মেকানিক বলেও অল্পবিস্তর খ্যাতি ছিল। ঠেলে গাড়িটাকে একটা মিটমিটে ল্যাম্পপোষ্টের কাছে এনে পরীক্ষা শুরু করে দিলাম। সিলেণ্ডারেই জল ঢুকেছে। সব ঠিকঠাক করতে প্রায় ঘণ্টাখানেক লাগল—তারপর ষ্টার্ট দিয়ে চলতে শুরু করলাম। মিনিট দশেক চলবার পর দেখি রাস্তার তুধারে ঘন জঙ্গল—কাছে পিঠে কোথাও লোকজনের বসতি নেই। কেমন যেন ভয় ভয় করতে লাগল—কাছে অতগুলো টাকা, না এলেই ভাল করতাম, কিন্তু এখন অনুতাপে কোনও ফল হবে না। জোর করে মন থেকে ভয়টাকে সরিয়ে দিয়ে একটু জোরেই গাড়ি চালাতে লাগলাম। সামনে মোড়, স্পীড কমিয়ে মোড় ঘুরতেই হঠাৎ একটা ঘন জঙ্গলের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল কালো বর্ষাতিতে আপাদমস্তক ঢাকা ইয়া দৈত্যের মত একটা লোক। পথের মাঝখানে দাঁড়িয়ে হাত তুলে দাঁড়াতেই বাধ্য হয়ে গাড়ি থামালাম।

কোনও কথা না বলে নিজেই দরজা খুলে আমার পাশে উঠে বসল লোকটা, তারপর আদেশের ভঙ্গিতে বললে—চালাও।

ও যেন মনিব, আমি মাইনে করা ড্রাইভার এইরকম ভাবখানা। মনে মনে রাগ হলেও ওর চেহারা দেখে কিছু বলতে সাহস হল না। চুপ চাপ গাড়ি চালাতে লাগলাম।

মিনিট পাঁচেক নিঃশব্দে কাটবার পর লোকটা বললে—আমাকে চিনতে পারনি বোধহয়? পথের দিকেই দৃষ্টি রেখে বললাম,—না।

—এত রাতে এই জঙ্গলের মধ্যে তোমার গাড়ি থমিয়ে এভাবে কেন উঠে বসলাম জানতে কৌতুহল হচ্ছে না তোমার?

—হলেই বা করছি কি? ভয়ে ভয়ে বললাম।

একটা অব্যক্ত কাতরানির আওয়াজ শুনে চেয়ে দেখি—যন্ত্রণায়

মুখ বিকৃত করে পিছনের সিটে মাথাটা হেলিয়ে দিয়ে লোকটা প্রাণপণে নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করছে।

বললাম, তোমার কি কোনও অসুখ করেছে?

মিনিট খানেক চুপ করে রইল লোকটা, পরে আস্তে আস্তে বললে —ডান পাটা গুলিতে জখম হয়েছে—এখনও গুলিটা বার হয়নি।

আঁৎকে উঠলাম। কী সর্ব্বনাশ! লোকটা ফেরারি আসামী নয়তো গুণ্ডা বদমাস, একটা কিছু হবেই। মনের প্রশ্নটা বুঝতে পেরেই বোধহয় লোকটা বললে—লালবাজার পুলিশ লক-অপ থেকে পালিয়ে আসছি। বাদশা খানের নাম শুনেছ?

কে না শুনেছে। পেশোয়ার থেকে এসে আজ ক' বছরের মধ্যেই গুণ্ডারাজ উপাধি পেয়েছে বাদশা খাঁ। বললাম, তাই যদি হয় তাহলে আবার কোন্ সাহসে কলকাতায় ফিরে যাচ্ছ তুমি? বরং বাইরে কোথাও গা-ঢাকা দেওয়াটা তোমার পক্ষে নিরাপদ হত।

পকেট থেকে একটা হুইস্কির ফ্লাস্ক বার করে ঢক ঢক করে খানিকটা খেয়ে নিল বাদশা। খানিকটা মুখ বেয়ে বাইরে ছিটকে পড়ল, মুখ বুজে ধাক্কাটা সামলে নিয়ে একটু পরে সহজভাবে বললে বাদশা, একটু ভুল হল তোমার। এখন থেকে যে কোনও গাড়ি কলকাতার বাইরে যাবে, পুলিশ সেগুলো কড়া সার্চ্চ না করে সহজে ছাড়বে না··। তার উপর তারা জানে আমি জখম। এ অবস্থায় সহজে তাহাদের চোখে ধুলো দিয়ে পালাতে পারবো না। কিন্তু বাইরে থেকে কলকাতায় ফেরবার গাড়িতে আমার ফেরবার কথা তারা ভাবতেও পারবে না, তবুও সাবধান হতে হবে।

ভয়ে প্রাণ আমার খাঁচাছাড়া হবার যোগাড়। তবুও জিজ্ঞেস করলাম—লালবাজার থেকে এতদূর এলে কি করে?

—একটা জানা ট্যাক্সিতে, শ্রীরামপুরের আগে নিজেই নেমে জঙ্গলে ঢুকে পড়লাম। পুলিশ জানে কলকাতার বাইরে যাবার চেষ্টা করবো আমি। এতক্ষণে রাস্তার মোড়ে মোড়ে কড়া পুলিশ পাহারা বসে গেছে। হঠাৎ সোজা হয়ে উঠে বসল বাদশা, শিকারী বেড়ালের মত

অন্ধকারে ওর চোখ দুটো জ্বলে উঠল যেন। বললে—সামনে মোড়টা পেরুলেই পুলিশ গাড়ি থামাবে, হয়তো সার্চ্চও করবে। ইচ্ছে করলে আমাকে ধরিয়ে দিয়ে মোটা পুরস্কার নিতে পার তুমি···নয়তো একটু মিথ্যার অভিনয় করলে বেঁচেও যেতে পারি এ যাত্রা। যা তোমার ইচ্ছে করতে পার।

বলেই আমার উত্তরের অপেক্ষা না করেই হুইস্কি ফ্লাস্কটা পকেট থেকে বার করে গায়ে, সিটের চারপাশে খানিকটা ছড়িয়ে দিয়ে বেহুঁশ মাতাল হওয়ার ভঙ্গিতে মাথাটা দরজার উপর হেলিয়ে দিয়ে এক অপরূপ ভঙ্গিতে শুয়ে পড়লো বাদশা খাঁ।

ওর অনুমানই ঠিক। মোড় ঘুরতেই লাল মুখ সার্জন সঙ্গে দু'তিন জন দেশী পুলিশ নিয়ে পথ আটকে দাঁড়াল। গাড়ী থামিয়ে দেখি সার্জেনটার এক হাতে রিভলভার অন্যহাতে একটা পাওয়ারফুল টর্চ। কাছে এসে ইংরাজিতে জিজ্ঞেস করলো—কোথা থেকে আসছ ?

বললাম— বর্দ্ধমান থেকে।

আবার প্রশ্ন—এই জল-ঝড়ে বর্দ্ধমান থেকে রাত্রে ফেরবার কী এমন দরকার হয়ে পড়ল ?

উত্তর দেবার আগেই টর্চটা জ্বালিয়ে গাড়ীর মধ্যে ফেলেই প্রশ্ন,—হু ইজ দ্যাট ?

যা থাকে কপালে, বললাম—আমার একটি সহকর্মী বন্ধু।

গাড়ীটা ঘুরে বাদশার কাছে এসে দাঁড়াল সার্জেনটা। আমার বুকের মধ্যে হাতুড়ীর ঘা পড়ছে তখন।

গাড়ীর মধ্যে মুখ ঢুকিয়ে হুইস্কির গন্ধে মুখটা তাড়াতাড়ি বাইরে নিয়ে আমায় জিজ্ঞেসা করলো – তোমার বন্ধুটি একটু বেশী আনন্দ করে ফেলেছেন দেখছি। ভিতরে হাত ঢুকিয়ে বাদশার পকেট থেকে ফ্লাস্কটা বার করে আলোর দিকে ধরে বললো —মাই গড, সবই প্রায় শেষ করে ফেলেছে। ছিপিটা খুলে যেটুকু অবশিষ্ট ছিল মুখে ঢেলে শিশিটা দূরে ফেলে দিয়ে বললে—পথে আসতে আর কোনও গাড়ী বা ট্যাক্সি দেখতে পেয়েছ বাবু ?

বললাম—না। এই দুর্যোগে আমার মত দায়ে না পড়লে কে আর সাধ করে পথে বার হবে। বলে পাশের বন্ধুটিকে দেখিয়ে দিলাম।

হো-হো করে হেসে উঠল সার্জেনটা, বললে—আমরা যাকে খুঁজছি তার একান্ত দরকার এই রাতের অন্ধকার, বাইরের দুর্যোগ আর নির্জন পথ।

অবাক হবার ভান করে বললাম—কে এমন লোক?

জবাবটা চাপা পড়ে গেল বাদশার কাৎরানি আর বমির আওয়াজে। দেখি, সামনে ঝুঁকে পড়ে বমি করে গাড়িটা ভাসিয়ে দিচ্ছে বাদশা।

হুইস্কির উগ্র গন্ধের সাথে বমির একটা ভ্যাপসা দুর্গন্ধ মিশে পেটটা গুলিয়ে উঠল। বললাম—তোমার প্রশ্ন যদি শেষ হয়ে থাকে তাহলে দয়া করে তাড়াতাড়ি যাবার অনুমতি দাও। আমার বন্ধুর অবস্থাটা দেখছ তো? শিগ্গির একে বাড়ি পৌছে দিতে না পারলে—

ইচ্ছে করেই শেষ করলাম না কথাটা। অবস্থাটা বুঝেই বোধহয় কোনও কথা না বলে বুক-পকেট থেকে নোটবই ও পেন্সিলটা বার করে একটা পুলিশকে ইসারা করলে টর্চটা উঁচু করে ধরতে, তারপর গাড়ির পা-দানির উপর একটা পা তুলে পেন্সিলটা বাগিয়ে ধরে বললে—নাম?

—হরিকিঙ্কর বটব্যাল।

—হোয়াট?

আবার বললাম নামটা। মিনিটখানেক অবাক হয়ে আমার দিকে চেয়ে থেকে বললে—অদ্ভুত নাম। হ্যারিকিংকর ব্যাটবল?

বললাম—হ্যাঁ।

—কি কর?

—বিলডিং কনট্রাকটারি!

সামনে গিয়ে গাড়ির নম্বরটা দেখে সেটা লিখে নিয়ে নোটবই ও পেনসিলটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললে—সই কর।

সই করে নোটবইটা ফেরৎ দিলাম। এবার টর্চটা বাদশার ওপর ফেলে বললে—তোমার বন্ধুর নাম?

সত্যিই বিপদে পড়লাম। ভাববার সময় নেই, বললাম—ভবতোষ চক্রবর্তী।

—কি করে?

—আমার সহকর্মী—মানে কন্‌ট্রাকটারি।

—ওর যা অবস্থা—নাম সই করতে পারবে না নিশ্চয়ই। বলে পকেট থেকে পেনটা বার করে বাদশার ডান হাতটা সন্তর্পণে তুলে ধরে বুড়ো আঙুলটায় বেশ করে কালি লাগিয়ে টিপসই নিয়ে নোট-বইটা পকেটে রাখতে রাখতে বললে—কিছু মনে করো না বাবু, একটা দুর্দান্ত ডাকাতের খোঁজ করছি আমরা। উপরওলার হুকুম, গাড়ি দেখলেই থামিয়ে ভাল ক'রে সার্চ করে নাম-ধাম-নম্বর ও লাইসেন্স নিয়ে তবে ছেড়ে দেবার। কাল সকাল দশটায় লালবাজার থেকে লাইসেন্সটা ফেরৎ নিয়ে যেও। ইউ ক্যান গো নাউ।

ষ্টার্ট দিলাম। ব্যাটারি উইক। ষ্টার্ট কিছুতেই নেয় না গাড়ি। উপায়?

অস্পষ্ট কাৎরানির মধ্যে কি যেন বললে বাদশা। কথাগুলো সব না বুঝলেও ইঙ্গিতটা বুঝলাম। মুখ বার করে হাত ইসারায় সার্জেনটাকে কাছে ডেকে বললাম—ইফ ইউ ডোণ্ট মাইণ্ড প্লিজ—

আর বলতে হল না। সঙ্গের পুলিশ দুটোকে পিছনে যাবার ইঙ্গিত করে বাদশার পাশের দরজাটা ধরে ঠেলতে শুরু করলো গাড়িটা। বেশ কিছুদূর ঠেলে নেবার পর ষ্টার্ট নিল গাড়ি। অশেষ ধন্যবাদ জানিয়ে যাত্রা করলাম। ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো।

কপাল ভাল পথে আর কোনও বাধা পেলাম না—বালী ব্রীজের কাছে এসে গেলাম। সোজা হয়ে বসে বেশ সহজভাবে বাদশা বললে—সোজা যেও না—ঘুরিয়ে বাঁক দিয়ে ব্রীজের ওপর দিয়ে চল। একটু অবাক হয়ে ওর দিকে চাইতেই বললে—হাওড়া দিয়ে যাওয়া খুব বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। প্রথমতঃ রাস্তার আলো—তার উপর দশ হাত অন্তর পুলিশ পাহারা। তাদের চোখে ধুলো দিয়ে পালান সোজা হবে না।

ব্রীজ পার হয়ে পূব মুখো রাস্তাটা ধরে একটুখানি যেতেই বাদশা বললে—থামাও গাড়ি। এখানে নামবো আমি।

চেয়ে দেখি নির্জন অন্ধকার পথ, চারদিক একদম ফাঁকা। কোথাও মানুষের বসতি নেই।

দরজা খুলে নামতে গিয়েই বিকট আর্তনাদ করে পা-দানির ওপর পড়ল বাদশা। তাড়াতাড়ি নেমে কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই যন্ত্রণা-কাতরস্বরে বললে—একভাবে বসে থেকে জখমি-পা-টা অসাড় হয়ে গেছে বাবু।

নিচু হয়ে দেখি ডান পাটা দু'হাতে ধরে দাঁতে দাঁত চেপে জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিচ্ছে বাদশা। বললাম—পা-টা টেনে দেব?

মাথা নাড়ে বাদশা। তারপর অতি কষ্টে বললে—এখনই ঠিক হয়ে যাবে। তোমাকে অনেক কষ্ট দিলাম বাবু। ভাল করে দেখি ডান প্যাণ্টটা রক্তে লাল হয়ে গেছে।

বাদশা বললে——বমিটা না করলে সার্জেন ব্যাটা ঠিক ধরে ফেলতো—এত রক্ত লুকোতাম কোথায়? ঘেন্নায় ব্যাটা কাছে এসে ভাল করে দেখেনি তাই রক্ষে।

দরজা ধরে অতি কষ্টে উঠে দাঁড়াল বাদশা। একটু দম নিয়ে বলল—কাছেই আমার দলের লোক-জন আছে। আজ রাত্রেই অপারেশান করে গুলিটা বার করতে না পারলে--।

বাধা দিয়ে বললাম—চল, তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি, এ অবস্থায় হাঁটলে—

দূর থেকে একটা হুইসিল-এর তীক্ষ্ণ আওয়াজ ভেসে এল। চোখের নিমিষে পকেট থেকে একটা হুইসিল্ বার করে দু'বার বাজালো বাদশা। তারপর হেসে বললে—আমার লোক এসে গেছে বাবু, এবার তুমি নিশ্চিন্ত মনে যেতে পার।

কাষ্ঠ হাসি হেসে বললাম—নিশ্চিন্ত মনেই বটে। তুমি কি ভুলে গেছ, সার্জেনটা গাড়ির নম্বর নাম-ধাম এমন কি ড্রাইভিং লাইসেন্সটা পর্যন্ত নিয়ে গেছে! তাতেও ক্ষতি ছিল না—যদি-না তোমার হাতের

টিপ-সইটা নিতো। মিলিয়ে দেখে কাল আমায় নিয়ে ওরা কি করবে বুঝতে পারছ ?

—খুব পারছি বন্ধু। আজ তুমি আমার জান বাঁচিয়েছো—বাদশা খাঁ গুণ্ডা হলেও নিমকহারাম, অকৃতজ্ঞ নয়। তোমার ঋণ টাকা দিয়ে শোধ করবার নয় তাছাড়া তোমার কোটের বাঁ দিকের পকেটে অনেক টাকা রয়েছে—অন্য সময় হলে ওগুলো তোমার অজ্ঞাতসারে আমার পকেট ভারি করতো। থাক সে কথা—কিছুটা ঋণ-শোধ করবার জন্য এগুলো রেখে দাও বাড়ি গিয়ে পুড়িয়ে ফেলো।

আমাকে বিস্ময়-সাগরে হাবুডুবু খাইয়ে পকেট থেকে বার করল বাদশা—সার্জেণ্ট-এর সেই পুলিশি নোট বইটা—যাতে আছে আমার নাম-ধাম বাদশার টিপ-সই—সব। অবাক হয়ে হাত বাড়িয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে আছি দেখে বাদশা বললে—কি করে সরালাম ভাবছ বন্ধু ? খুব সোজা। আমিই ইচ্ছে করে গাড়িটা বিগড়ে রেখেছিলাম, যাতে না ঠেললে স্টার্ট না নেয়। আর এও জানতাম, ও ব্যাটা আমার পাশে দাঁড়িয়েই ঠেলবে পেছন থেকে নয়।

সামনের অন্ধকারে চেয়ে কি যেন দেখতে পেল বাদশা। হঠাৎ আমার হাত দুটো জড়িয়ে ধরে বললে—আমার লোক এসে গেছে। বিদায় বন্ধু—।

গাড়িটা হেলান দিয়ে নোট বইটা হাতে করে ঠায় দাঁড়িয়ে রইলাম। অন্ধকারে ওদের পায়ের আওয়াজ ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল।

আজব দুনিয়া

আজব ফিল্ম্ দুনিয়ায় কী না সম্ভব! আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ একটা ঘটনার কথা বলছি, সবে ফিল্মএ অভিনয় করতে নেমেছি, মেক আপ রুমে এক পাশে বসে বড় বড় অভিনেতাদের আলাপ আলোচনা মন দিয়ে শুনছি, পারিবারিক থেকে সুরু করে অনেক বিষয়ে আলোচনা চলছিল। একজন বললেন, আর বলেন কেন মশাই, খ্যাতির বিড়ম্বনা আর কি, সকাল থেকে শুধু লোক আর লোক, কেউ এসেছে ফিল্ম-এ ঢুকিয়ে দিন—কেউ ষ্টুডিয়োতে যে কোন একটা চাকরী দিন স্যার, কেউ এসেছে খাতা বগলে ফিল্মএর গল্প শোনাতে, তিতে ত্যক্ত হয়ে গেলাম মশাই।

অপর অভিনেতাটি সব শুনে বিজ্ঞের হাসি হেসে বললেন—ওতেই অতিষ্ঠ হয়ে গেলেন মশাই? স্ত্রীকে পাঠিয়েছে অন্দরে আমার স্ত্রীকে ধরে বেকার স্বামীর চাকুরীর জন্য। অনেক ভেবে একটা উপায় ঠিক করেছি। চাকরকে কড়া হুকুম দিয়ে রেখেছি কাউকে দরজা খুলে বাইরের ঘরে বসতে দেবে না—দরজা থেকেই বিদায় করে দেবে। খুব সকালে যারা আসবে তাদের বলবে বাবু ঘুমুচ্ছেন—উঠতে অনেক দেরি হবে। একটু বেলায় যারা আসবে তাদের বলবে বাবু বাড়ী নেই—ব্যাস্। বেঁচে গেছি মশাই, একটু নির্ম্মম হতে হয়েছে কিন্তু উপায় কি?

বিদ্রোহী মন মাথা উঁচু করে দাঁড়াল—ভাবলাম আমি যদি কোনওদিন বড় হয়ে এঁদের পর্য্যায়ে পৌঁছুতে পারি কাউকে ফেরাবো না। চাকরী হয়তো সবাইকে দিতে পারবো না—কিন্তু ঐসব অবজ্ঞাত সহায়হীন উমেদারের মধ্যে দু একটি সত্যিকার প্রতিভাও তো লুকিয়ে থাকতে পারে। আমার একটু সাহায্যে যদি ওদের অন্ধকার জীবনে আলোর আভাষ দেখা দেয় সেটাই কি কম? তা ছাড়া কত দূর থেকে কতখানি

আশা নিয়ে আসে ওরা তুমিনিটের জন্য দেখা করে তুটো মিষ্টি কথা বলে বিদায় করে দিলে—কোনও পক্ষেই তুঃখ করবার কিছু থাকে না।

তারপর নদীর ঢেউ এর মত বছরের পর বছর কেটে গেছে—যুগ গেছে পালটে, নীরব ছবি ডিগবাজি খেয়ে কথায় গানে মুখরিত করে তুলেছে আকাশ বাতাস, কিন্তু হায়—আমার খোলা দরজা দিয়ে সাহায্যের প্রার্থনা নিয়ে কোনও উমেদার এলনা।

নায়কের খোলস ছেড়ে বাধ্য হয়ে টাইপ চরিত্রের আড়ালে আত্মগোপন করার কিছুকাল পরেই মুক্তি পেল—'কালোছায়া' ও 'কঙ্কাল'—ব্যস ভাগ্যদেবতা পথ চল্‌তে চল্‌তে হোঁচট খেয়ে আড়চোখে ফিরে তাকালেন। বহু আকাঙ্খিত যশ খ্যাতি খানিকটা পেলাম।

আগের দিন নাইট সুটিং গেছে, অনেক রাতে ফিরেছি। ভোর বেলায় চাকরটা এসে দোর ঠেলছে। কি ব্যাপার ? একজন বাবু দেখা করতে এসেছেন—বলছেন বিশেষ দরকার।

একবার ভাবলাম, বলি—বলে দে খুমুচ্ছেন উঠতে দেরি হবে, আবার মনে হল হয়ত সত্যি বিশেষ দরকার। কষ্টে অনিচ্ছার সঙ্গে উঠে এক রকম ঘুমের ঘোরেই নীচে নামলাম। বাইরের ঘরে ঢুকে দেখি বসে আছে পনেরো ষোলো বছরের একটি ছেলে। চেয়ারের ওপর পা তুটো তুলে দিয়ে টেবিলটার ওপর তবলার বোল সাধছে। আমাকে দেখেই বাজনা থামিয়ে উঠে দাঁড়াল ছেলেটি। তারপর একগাল হেসে বললে—ভোরে এসে ঘুম ভাঙালুম বলে নিশ্চয়ই আমার ওপর চটেছেন।

রাগটাকে অতি কষ্টে হজম করে গম্ভীর ভাবে বললাম—কি বিশেষ দরকার তোমার ?

না, মানে আমি ই'য়ে আপনাদের ফিল্মএ নামতে চাই।

—ক'দ্দুর পড়াশুনা করেছ ?

আজ তুবছর ক্লাশ নাইন থেকে প্রমোশন পাইনি। তাই ভাবলাম ফিল্ম-এ ঢুকে পড়ি—আখেরে কাজ দেবে।

জবাব খুঁজে পাই না, রাগে সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে যায়—তবুও শান্ত কণ্ঠে বলি—তোমার বয়সী ছেলের পার্ট যদি কোনও ছবিতে দরকার হয় খবর দেবো—ঠিকানা রেখে যাও। উঠে দাঁড়িয়ে বলে—খবর যা দেবেন 'মা গঙ্গাই জানেন'। দেখুন স্যার—সব নাম করা অভিনেতার দোরে দোরে ঘুরেছি—বেশীর ভাগ দেখাই করেন নি। যাদের অনেক মাথা খাটিয়ে পাকড়াও করেছি তারা ঐ কথাই বলেছেন—ঠিকানা রেখে যাও, খবর দেব।

জবাব না দিয়ে চলতে শুরু করি। পিছন থেকে চীৎকার করে ছেলেটি বলতে থাকে—রাগই করুন আর যাই করুন—আমি কিন্তু মধ্যে মধ্যে এসে বিরক্ত করে যাব।

এই থেকেই সূচনা, তারপর কত বিচিত্র টাইপের লোক এলো গেলো—কেউ চায় অভিনেতা হতে, কেউ ক্যামেরা-ম্যান—কেউ পরিচালনা—কেউ চায় তার পরিচিতা অথবা আত্মীয় মেয়েকে ফিল্মে একটা চান্স দিতে—কত আর বলবো। সময়েরও মা, বাপ নেই—সকাল ছটা থেকে রাত্রি দশটা—সাড়ে দশটা পর্য্যন্ত। যদি প্রশ্ন করেছি এত রাত্রে কেন এলেন? তৎক্ষণাৎ জবাব পেয়েছি—কি জানেন স্যার অন্য সময় এলে দেখাই পাইনা—আর তাছাড়া কথাবার্ত্তা বলার সময়ও থাকে না আপনাদের, তাই—

বহুদিনের পুরোনো কথা সেই অভিজ্ঞ দুটি অভিনেতার কথোপ-কথন মনের দরজায় উঁকি দিয়ে বেশ একটু শ্লেষের সঙ্গেই বললে—এখন বুঝতে পারছ কেন আমরা মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে আত্মগোপন করে বাঁচবার চেষ্টা করতাম? এইবার ঠ্যালা বোঝো।

তবুও পারতাম না। মনে হত এদের মধ্যে যদি সত্যিকার দু একটা লোক থাকে যাদের প্রতিভা আছে, তুলে ধরবার লোক নেই, আমার সামান্য একটু ইসারায় যদি এরা পথের সন্ধান পায়—আর তা ছাড়া এই সব বিচিত্র অভিজ্ঞতার মুল্যও তো কম নয়, হোক্ খানিকটা সময়ের অপব্যবহার, তবু শেষ পর্যন্ত না দেখে ছাড়বো না।

একটা নতুন ছবি সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা পাকা করবার জন্য সেদিন সকালে নটায় পরিচালক, প্রযোজক এবং আরও ২।৩টি লোক এসে হাজির। ঘণ্টা খানেক ধরে তাদের সঙ্গে দর কষাকষি করে সব ঠিক হয়ে গেল। নমস্কার করে তাঁদের বিদায় দিয়ে উপরে যাবার জন্যে দাঁড়িয়েছি— বাইরের ভেজান দরজাটা ঈষৎ ফাঁক করে উঁকি দিল একটা মুখ— "মে আই কাম ইন?"

অভ্যর্থনার প্রয়োজন হল না— সশব্দে দরজাটা খুলে ভেতরে ঢুকে হুড়মুড় করে সামনের চেয়ারটা ঠেলে সরিয়ে আমার পায়ের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়লেন ভদ্রলোক। কতগুলি লোক আছে, যাদের দেখবামাত্র বিনা কারণেই মন বিতৃষ্ণায় ভরে যায়- আগন্তুক তাদেরই মধ্যে একজন। রোগা ডিগডিগে হাড় বের করা চেহারা, রোদে পোড়া তামাটে রং,—মাথায় রুক্ষ একরাশ চুলের বোঝা—কতকগুলো আগাছার মত কপালের ওপর নেতিয়ে পড়ে আছে—এক মুখ খোঁচা খোঁচা দাড়ি গোঁপ। সজারুর কাঁটার মত স্বতন্ত্র ভাবে মাথা খাড়া করে আছে। পরণে ময়লা সরুপাড় ধুতি, গায়েও ততোধিক ময়লা ছিটের সার্ট। দীর্ঘ দিন ব্যবহারে গলার কাছে তেল ময়লা জমে কালো হয়ে উঠেছে। ভদ্রলোক ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই একটা বিশ্রী উৎকট গন্ধ ঘরের আবহাওয়াটাই বিষিয়ে তুলল। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম শেষ করে উঠে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে গরুড় পাখির ভঙ্গিতে দাঁড়ালেন ভদ্রলাক। চুপ চাপ।

অগত্যা আমাকেই কথা শুরু করতে হয়, বলি—আপনি?

"আপনি নয়, তুমি। আমি আপনার পুত্রতুল্য। পুত্র না থাকার ক্ষোভ খানিকটা প্রশমিত হল। বললাম—তোমার নাম?

শ্রীহৃদয় রঞ্জন দাস—দেশের গাঁয় আমাকে হৃদি রঞ্জন বলে সবাই ডাকে।

অনিচ্ছায় প্রশ্ন করি— বাড়ি?

খুলনা জেলায়। বাগেরহাট সাবডিভিসনে। আপনি আমার দেশের লোক সেদিক দিয়েও খানিকটা দাবী আমার আছে।

অবাক হয়ে বলি—আমার বাড়ি যশোর জেলায় আর তোমার বলছো—মুখের কথা কেড়ে নিয়ে হৃদয়রঞ্জন বলে—আজ্ঞে যশোর খুলনে কি আলাদা? তাছাড়া আপনি আমায় চেনেন। এক গাল হেসে চেয়ে থাকে হৃদয়রঞ্জন।

স্মৃতি সমুদ্র মন্থন করেও কুল কিনারা পাই না। ওই কুল দেখায়, বলে, - একবার খুলনায় দুর্গাদাসবাবুর সঙ্গে মন্ত্রশক্তি প্লে করতে গিয়েছিলেন মনে আছে?

না থাকবার কথা নয়, মাথা নেড়ে জানাই—হ্যাঁ।

সেইখানেই আপনার সঙ্গে প্রথম দেখা। এখনও চিনতে পারলেন না? বেশ আমিই মনে করিয়ে দিচ্ছি। মৃগাঙ্কের বাইরের ঘরে যেখানে জহরা বাঈজীর গান, সেই সিনে আমি মৃগাঙ্কের মোসাহেব বন্ধুদের একজন সেজেছিলাম। মনে পড়ছে? সত্যি কথা বলে হৃদয় রঞ্জনকে আঘাত দিতে চক্ষুলজ্জায় বাধে—ঘাড় নেড়ে কোনও মতে সমর্থন জানিয়ে বলি—ও হ্যাঁ, তা আমি তোমার কি করিতে পারি?

—কী না পারেন, আমি আপনারই ভরসায় পাকিস্থানের ঘর বাড়ি স্ত্রী পুত্র সব ছেড়ে এসেছি।

সর্ব্বনাশ! এ বলে কি?

রীতিমত যাত্রার এ্যাকটিংএর ভঙ্গিতে বলতে সুরু করে হৃদয়রঞ্জন —সেই যে কী বিষ ছড়িয়ে এলেন খুলনায় আপনি আর দুর্গাদাস বাবু। সেই থেকে আমার একমাত্র ধ্যান জ্ঞান স্বপ্ন হল অভিনেতা হওয়া। বাড়ীতে তিনটি পানের বরজ ছিল—আপনার আশীর্ব্বাদে অবস্থা গাঁয়ের মধ্যে বেশ ভালই ছিল—কিন্তু আর জাত ব্যবসা ভাল লাগেনা। মাইনে করা লোকের ওপর বরজের ভার দিয়ে যাত্রার দল খুললাম—কিছুদিন বাদে তা তুলে দিয়ে থিয়েটার করতে আরম্ভ করলাম। চাণক্য থেকে আরম্ভ করে সব বড় বড় পার্টই আমার কণ্ঠস্থ। অনেক মেডেলও পেয়েছি। একদিন নিয়ে এসে—

অসহিষ্ণু হয়ে বাধা দিই—বলি, তোমার আসল বক্তব্যটা কি তাই বল - আমি একটু ব্যস্ত আছি।

সিনেমার একটা পার্ট, ছোট পার্টই দিন—ক্ষমতা থাকে—তাতেই আমি দেখিয়ে দেবো। এই ছিনে জোঁকের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য উঠে দাঁড়িয়ে বলি—আমি চেষ্টা করবো, তুমি পরে আমার সঙ্গে দেখা কোরো। উত্তরের অপেক্ষা না করে তাড়াতাড়ি উপরে উঠে গেলাম।

এর পরের তিনটে মাস এক দিকে যেমন হাস্যকর তেমনি করুণ ও মর্ম্মান্তিক। সকাল বিকাল সন্ধ্যে কোন্ সময় যে হৃদয়রঞ্জনের আবির্ভাব হবে কেউ বলতে পারে না - নিজের বাড়িতে লুকিয়ে থাকি। দু একদিন ষ্টুডিও যাবার পথে দেখা হয়ে যায়, বলি—চেষ্টা করছি—আমার মনে আছে। চেষ্টাও করেছিলাম, কয়েকটি পরিচিত পরিচালককে ওর কথা বিশেষ করে বলেও দিয়েছিলাম। কিন্তু তাতে হিতে বিপরীত হল। একজন বললে—আচ্ছা লোক পাঠিয়েছিলে ভাই, ওই তো চেহারা। ছোট এক আধ সিনের পার্ট করবে না। বলে—ধীরাজবাবু যে ধরনের রোল করেন, দিয়ে দেখুন পারি কি না।

রাগও হয় দুঃখও হয়। এরই মধ্যে খবর নিয়ে জেনেছিলাম, দেশের বাড়ীখানা ছাড়া জমিজমা পানের বরজ সব হৃদয়রঞ্জন থিয়েটার যাত্রার পিছনে খুইয়েছে। সামান্য যা নগদ এনেছিল তা দিয়ে কয়েকদিন হোটেলে খেয়ে কিছুদিন উপোস করে কোনও মতে দিন কাটাচ্ছে।

কয়েকদিন ধরে হৃদয়রঞ্জন পার্টের তাগাদায় আসে না। প্রথমটা ভেবেছিলাম অসুখ বিসুখ করেছে। আরও কিছুদিন কেটে গেল তবু দেখা নেই। ভাবলাম এতদিনে হয়তো সুমতি হয়েছে—দেশে গিয়ে জাত ব্যবসায় মন দিয়েছে। হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। আরও কিছুদিন বাদে কাজের ভিড়ে ওর কথা একদম ভুলেই গেলাম।

কি একটা ছবির সুটিং এ ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিও গেছি। দূর থেকে দেখি দু নম্বর ফ্লোরের ফুলবাগানের সামনে পায়চারি করছে হৃদয়রঞ্জন। প্রথমটা চিনতেই পারিনি। পরণে আধ ময়লা খাকি প্যান্ট, সাদা

হাফ সার্ট—দাড়ি গোঁফ কামানো—ঝাঁটার মত চুলগুলো ওপর দিকে ব্যাকব্রাস করা। চোখাচোখি হতেই দাঁড়িয়ে পড়লাম। আস্তে আস্তে কাছে এসে দাঁড়ালো হৃদয়রঞ্জন। তারপর গম্ভীর ভাবে হাত তুলে নমস্কার করে চুপ করে দাঁড়ালো। বললাম—ব্যাপার কি? তোমায় আর দেখতে পাইনে কেন?

রোজই সুটিং। যাবার ফুরসুৎ পাইনে।

বেশ কিছুটা অবাক হয়ে বললাম, রোজ সুটিং? কোন্ ছবিতে কাজ করছ? সরাসরি প্রশ্নটার জবাব না দিয়ে কতকটা যেন আপন মনেই বলতে লাগলো হৃদয়রঞ্জন—অনেক চেষ্টা করলাম, দেখলাম সব ডিরেক্টরই এক জোট—ভাল পার্ট কিছুতেই আমাকে দেবে না। তাই ভেবে চিন্তে ডিরেকসন লাইনেই ঢুকে পড়লাম। ডিরেক্টর হলে আর কেউ আমাকে রুখতে পারবে না। আর বড় ডিরেক্টর বলতে বড়ুয়া সাহেব ছাড়া আর কেই বা আছে, তাই ওঁরই সহকারী হয়ে কাজ করছি।

সেদিনও বড়ুয়া সাহেবের সুটিং ছিল। ঘণ্টা বাজতেই ব্যস্ত সমস্ত ভাবে হৃদয়রঞ্জন বললে—চলি—এখনই সুটিং আরম্ভ হবে, পরে দেখা করবো।

স্থাণুর মত চলৎশক্তি রহিত হয়ে ঐখানেই দাঁড়িয়ে রইলাম। পরিচিত ইলেকট্রিক কর্মী মন্মথ পাশ দিয়ে যেতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। আমার দৃষ্টি অনুসরণ করে বললে—ওটাকে চেনেন নাকি?

সম্বিত ফিরে পেলাম, বললাম—চিনি বলেই এতদিন মনে করতাম, আজ দেখলাম ওকে আমি চিনতেই পারিনি।

মন্মথ বললে—গেরোর কথা আর বলেন কেন মশাই। শ্বশুরবাড়ীর গ্রাম সম্পর্কে আমার কি রকম শালা হয়। একদিন বৌবাজার ষ্ট্রীটের মোড়ে দেখা। তিনদিন খায়নি, আর কাপড় জামার যা অবস্থা তাতে কাছে দাঁড়াতেই ঘেন্না করে। কি করি বাসায় নিয়ে এলাম। ব্যাস্—খাল কেটে কুমীর আনলাম। খায় দায় আর রাতদিন গলা ছেড়ে এ্যাকটিং করে আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করে—ও কত বড় এ্যাক্টার।

বাসার অন্য ভাড়াটেরাও অতিষ্ঠ হয়ে উঠে। কয়েকদিন বাদে আমাকে ডেকে স্পষ্টই বলে দিলে—বাসা ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে, নইলে তারা পুলিশে খবর দেবে। মহা চিন্তায় পড়লাম।

একদিন কথায় কথায় বলে ফেলি, আমি ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওয় ইলেকট্রিকের কাজ করি। এবং বড়ুয়া সাহেবকে চিনি। আর যায় কোথা—গোদের উপর বিষফোড়া। ধরে বসলো, আমাকে বড়ুয়া সাহেবের সহকারী করে দাও।

ভাবুন তো মশাই। ঐ মুর্ত্তি নিয়ে বড়ুয়া সাহেবের সঙ্গে দেখা করে সহকারী করে নেবার উমেদারি করতে গেলে আমার চাকরী নিয়ে টানাটানি পড়বে। অনেক ভেবে আমার একটা পুরানো খাঁকি প্যান্ট ও ছিটের সার্ট পরতে দিলাম। বললাম,—একটু ফিট-ফাট থাকতে চেষ্টা কর। একদিন বড়ুয়া সাহেবকে নির্জ্জনে পেয়ে একরকম কেঁদে পড়লাম, বললাম—আমায় বাঁচান স্যার। তারপর সব খুলে বললাম। সব শুনে হেসে ফেললেন বড়ুয়া সাহেব। বললেন, বেশ—যে দিন আমার সুটিং থাকবে, ফ্লোরে এসে দূরে দাঁড়িয়ে থাকবে—এইটুকু আমি করতে পারি মন্মথ—কিন্তু খবরদার, কাছে এসে কোনও আর্টিষ্টকে এ্যাকটিং শেখাবার চেষ্টা করে না যেন।

সেই দিন থেকে খানিকটা রেহাই পেয়েছি মশাই।

'মেক আপ ম্যান' শৈলেন এসে তাগাদা দিলে—এইবার আপনার সুটিং ধীরাজদা, মেক আপটা করে নিন।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মেক আপ রুমে ঢুকে পড়লাম।

ছয় মাস পরের কথা। সুটিং ছিল না; ডুপুর বেলা সময় কাটাতে গার্ডনারের একখানা ডিটেকটিভ বই পড়ছিলাম। পাশে টেলিফোন বেজে উঠল—একটু বিরক্ত হয়েই বললাম হ্যালো! অপর প্রান্ত থেকে অপরিচিত গলার স্বর ভেসে এল—আমি ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিও থেকে কথা বলছি, ধীরাজ বাবুকে দিন না।

বললাম,—কথা বলছি বলুন।

—দেখুন স্যার, আমরা একটা নূতন প্রতিষ্ঠান গড়ে একখানা ছবি তোলবার সব ব্যবস্থা পাকা করে ফেলেছি। সবার ইচ্ছা আমাদের প্রথম ছবিতে সব চেয়ে শক্ত ভিলেনের পার্টটা আপনি করেন, তাই—

—তার আগে আমি গল্পটা শুনতে চাই।

—আজ আপনার কোনও কাজ নেইতো স্যার?

—না।

—তাহলে গাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছি যদি দয়া করে একবার ষ্টুডিওয় আসেন। এক ঘণ্টার মধ্যে আপনাকে ছেড়ে দেব স্যার।

একবার ভাবলাম বলি, তার চেয়ে আপনারাই আসুন না আমার এখানে—বললাম না।

স্টুডিওয় পৌঁছে জিজ্ঞেস করতেই ট্রাম ডিপোর পশ্চিম দিকের ছোট্ট দোতালা বাড়ীটা দেখিয়ে দিলে। ওরই নীচের তলায় অন্ধকার ছোট একটা ঘর, খান চারেক চেয়ার, একটা চৌকো কাঠের ছোট টেবিল—দেওয়াল ঘেঁসে একটা লোহার আলমারী। অপরিচিত দুটো লোক চেয়ারে বসে সিগারেট খাচ্ছিলেন। আমায় দেখে সসম্মানে উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করে একজন বললেন,—বসুন, আমরা আপনারই জন্য অপেক্ষা করছি।

বললাম—কই আপনাদের পরিচালক, কাহিনীকার এঁরা সব কোথায়?

—এখুনি আসবেন, আপনাকে নামিয়েই গাড়ী চলে গেছে। চা খাবেন?

বললাম—না।

—পান?

—না।

এবার আর কোনও কথা না বলে পকেট থেকে এক প্যাকেট কাঁচি সিগারেট বার করে সামনে ধরলেন, অগত্যা ভদ্রতার খাতিরে তা থেকে একটা নিয়ে ধরালাম। ভদ্রলোক দুটী বাইরে চলে গেলেন—

বোধহয় পরিচালকের গাড়ির অপেক্ষায় গেটের সামনে রাস্তায় দাঁড়ালেন।

মিনিট পনেরো কাটলো—দেখা নেই। তারপর গাড়ির আওয়াজ পেলাম। বুঝলাম—পরিচালক মশাই-এর শুভাগমন হল। নড়ে চড়ে বসলাম। ঘুরে ঢুকলো সেই ভদ্রলোক ছুটীর সঙ্গে দামী প্যান্ট ও সিল্কের বুশ সার্ট পরা একটা মোটা ফাইল ও এক টিন গোল্ড ফ্লেক সিগারেট হাতে হৃদয়রঞ্জন দাস।

নমস্কার করে চেয়ারে বসতে বসতে হৃদয়রঞ্জন বললে—আমার আসতে একটু দেরি হয়ে গেছে। হিরোইনের বাড়ি একবার হয়ে এলাম কি না।

যাগগে। গল্পটা সব পড়তে আমার আড়াই ঘণ্টা সময় নেবে।—তার চাইতে আপনার পার্টটা পড়ে শুনিয়ে দিচ্ছি।

অতি কষ্টে ঢোক গিলে বললাম—গল্পটা লেখা কার? আর পরিচালনাই বা কে করবেন জানতে চাই।

টিন থেকে আর একটা সিগারেট বার করতে করতে গম্ভীর ভাবে হৃদয়রঞ্জন বললে—গল্প, চিত্রনাট্য, পরিচালনা সব আমিই করবো—জমিদার অটল বিহারীর পার্টটাও নিজে করবো বলে লিখেছি, কিন্তু প্রযোজক নিকুঞ্জ ধাড়া সাহস পাচ্ছেন না, উনি বললেন—এই আপনার প্রথম পরিচালনা তার উপর অতবড় শক্ত একটা রোল, ওটা ধীরাজ বাবুকে দিলেই সব দিক দিয়ে ভাল হয়। শুধু আপনার নাম শুনে রাজি হলাম, অন্য কারও নাম করলে ও পার্ট আমি ছাড়তাম না।

ব্লাড প্রেসার বা রক্তের চাপ কথাটাই শুধু এতদিন শুনে এসেছি। আজ স্পষ্ট অনুভব করলাম—পা থেকে শুরু করে সমস্ত রক্ত শিরা পথে ছুটে চলেছে মাথার দিকে—বহু দূর থেকে ভেসে আসা অস্পষ্ট ভ্রমর গুঞ্জনের মত হৃদয়রঞ্জনের কথা কানে এলো।

—অটল বিহারী গাঁয়ের জমিদার, যত গুণ্ডা বদমায়েসদের নিয়ে রাত্রে বন্ধ ঘরে রূপোর কলকেতে গাঁজা খায়—আর প্রজাদের সুন্দরী স্ত্রী কন্যাকে ধরে এনে কি করে তাদের—

আর কিছু শুনতে পেলাম না। বেঁচে গেলাম। খানিকটা রক্ত বোধ হয় পথ পেয়ে কান দুটোয় ঢুকে পড়েছে। শুধু শুনতে পাচ্ছি ঝিঁ-ঝিঁ পোকার এক ঘেয়ে ঝাঁ-ঝাঁ শব্দ। বাক্ ও শ্রবণ শক্তি রহিত হয়ে দূরে মহাশূন্যে চোখ দুটো মেলে বসে আছি। সামনে স্পষ্ট ফুটে উঠলো কিছুদিন আগে দেখা একখানি জাপানী ফিল্ম-এর হৃদয় বিদারক ভূমিকম্পের দৃশ্যটা।

বহু দুঃখ কষ্টের শেষে নায়ক—নায়িকার মিলন হয়েছে—বড় ডাইনিং রুমে বন্ধুবান্ধব নিয়ে খানা পিনার দৃশ্য। আচম্বিতে শুরু হল ভূমিকম্প—বড় বড় গাছ বাড়িগুলো চোখের নিমিষে মাটির ফাটলে অদৃশ্য হয়ে যেতে লাগলো।

নায়ক নায়িকার মিলন বোধ হয় ভগবানের অভিপ্রেত নয়—দেখতে দেখতে ঘরের ঠিক মাঝখান দিয়ে সরল রেখার মত অর্দ্ধেকটা ফেটে অদৃশ্য হয়ে গেল! সঙ্গে নিয়ে গেল নায়ককে আর তার কয়েকটি বন্ধু বান্ধবকে। অপর দিকে অক্ষত দেহে বেঁচে রইল নায়িকা।

আণবিক বোমার দৌলতে বিশ্বের, বিশেষ করে এশিয়ার আবহাওয়া গেছে বদলে। মনে মনে মা বসুন্ধরাকে বললাম—মাগো জাপানের আবহাওয়া খানিকটা নিয়ে এসে এই মুহূর্ত্তে আমায় নিয়ে এই ঘরের অর্দ্ধেকটা তুমি পাতালে চালান করে দিতে পারো? শুধু আজব ফিল্ম দুনিয়ার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করতে অক্ষত দেহে দীর্ঘ দিন বাঁচিয়ে রাখো একাধারে কাহিনীকার চিত্র নাট্যকার অভিনেতা ও পরিচালক—হৃদয়রঞ্জন দাসকে।

অব্যক্ত

দীর্ঘদিন বাদে অপ্রত্যাশিতভাবে দেখা হয়ে গেল সুকান্তর সঙ্গে।

আফিস ফেরতা ডালহাউসি থেকে শ্যামবাজার বাসায় ফিরছিলাম। অসম্ভব ভিড় ট্রামে। মাঝখানের রড ধরে দাঁড়িয়ে বাদুড় ঝোলা ঝুলতে ঝুলতে আসছিলাম। সামনে পিছনে আমারই মত অগুন্তি লোক দাঁড়িয়ে। লালবাজারের সামনের স্টপেজ থেকে গাড়ি ছাড়তেই হুমড়ি খেয়ে পড়লাম সামনের লোকটার ওপর। একেবারে মাথা ঠোকাঠুকি। পিছন থেকেই বললাম,—মাফ করবেন, একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম।

ঘাড় ফিরিয়ে চাওয়াও কষ্টকর ব্যাপার। তেমনি করেই সামনে চেয়ে লোকটী বিড় বিড় করে কি যে বললেন বুঝতে না পারলেও, মাফ যে তিনি করেননি এটা বুঝতে মোটেই কষ্ট হল না।

বোধহয় মাথার বাঁ দিকটায় বেশ লেগেছে। হাত দিয়ে বড় চুলগুলো সরিয়ে কানের পাশে হাত বুলাতে লাগলেন ভদ্রলোক। এক নজর দেখেই আঁৎকে উঠলাম—সুকান্ত! তাই বা কি করে হয়। ফর্সা ধবধবে রং নিটোল গোলগাল গড়ন চেয়ে দেখবার মত সুন্দর স্বাস্থ্য ছিল সুকান্তর।···

স্কুলে ওর সঙ্গেই ছিল আমার যা কিছু অন্তরঙ্গতা। সুকান্তর বাবা ভাগলপুরে নাম করা ডাক্তার। কলকাতায় এক দূর সম্পর্কের পিসির বাড়ি থেকে সুকান্ত স্কুলে পড়তো। অল্পদিনের মধ্যেই স্কুলে বেপরোয়া ডানপিটে নাম রটে গেলেও পড়াশুনায় সুকান্ত ছিল অসম্ভব ভাল। স্কলারশিপ নিয়ে ম্যাট্রিক পাশ করলো সুকান্ত, আমি ফার্ষ্ট ডিভিসনে। তারপর দুইজনেই ভরতি হলাম বিদ্যাসাগর কলেজে। একটা ব্যাপারে ভারি অবাক লাগতো আমার, কোনও ছুটীতেই সুকান্ত কলকাতা ছেড়ে মা বাপের কাছে ভাগলপুর যেত না।

ছু'একবার জিজ্ঞাসাও করেছিলাম। সুকান্ত বলতো—বাবার ইচ্ছে পড়াশুনো শেষ করে একেবারে ওখানে গিয়ে বসবো।

একদিন কলেজে এল না সুকান্ত। মনটা চঞ্চল হয়ে রইল। পরদিন সকালেই ওর পিসিমার বাড়ি গিয়ে হাজির হলাম। দেখি বাইরের ছোট ঘরটায় বালিশে মুখ গুঁজে শুয়ে আছে সুকান্ত। বললাম,—কি রে কাল কলেজে গেলিনে, আজও শুয়ে আছিস, অসুক বিসুক করল নাকি?

উঠে বাইরের দিকে চেয়ে চুপ করে বসল সুকান্ত। মাথার চুল রুক্ষ, চোখ মুখ বসে গেছে—এক দিনে এরকম পরিবর্ত্তন বড় একটা দেখা যায় না।

উৎকণ্ঠার সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলাম—ব্যাপার কি সুকান্ত?

দেখলাম ওর চোখ ছুটো জলে ভরে উঠেছে। রীতিমত অবাক হয়ে গেলাম। সুকান্তর চোখে জল এর আগে কোনও দিন কেউ দেখেনি। যার জন্যে ক্লাসের ছেলেরা ওর নতুন নামকরণ করেছিল—রিচার্ড দি লায়ন হার্ট।

ঐভাবেই বাইরে চেয়ে সুকান্ত বললে,—আমার ছোট বোন লাকিকে মনে আছে তোর?

চোখে না দেখলেও সুকান্তর কাছে এতবার শুনেছি ঐ বোনটীর কথা যে এক এক সময় মনে হত সে যেন আমাদের মধ্যেই মিশে আছে সব সময়। লাকির খুব ছোট বেলার একখানা ফটো সুকান্ত ক্লাসের সব ছেলেকেই দেখিয়েছে বার বার। লায়ন হার্টের হৃদপিণ্ডটা যে সবটাই আড়াল করে রয়েছে ঐ এক ফোঁটা মেয়ে লাকি—এ কথাটা আমাদের কারও কাছে অবিদিত ছিল না।

সত্যিই ভয় পেয়ে গেলাম, বললাম,—কি হয়েছে লাকির?

সুকান্ত বললে,—দিন দশেক আগে চিঠি পাই—লাকির অসুখ করেছে, আমায় দেখতে চাইছে।

যাবার খরচ পাঠাবার জন্য বাবাকে চিঠি দিলাম। তিনি লিখলেন—সামান্য সর্দ্দি জ্বর, এর জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়াশুনো কামাই করে

আসবার দরকার নেই। পরশু রাত্রে চিঠি পেলাম—লাকি মারা গেছে।

সান্ত্বনা দিয়ে লাভ নেই—আর দেবই বা কি বলে। চুপ করে বসে রইলাম। মনের মধ্যে তোলপাড় করছিল শুধু সুকান্তর বাবার এই বিসদৃশ অদ্ভুত আচরণের কথা।

কলেজের বেলা হয়ে যাচ্ছে। উঠেপড়ে বললাম,—বাড়িতে বসে থাকলে শুধু মন খারাপই হবে—তার চেয়ে কলেজে চলে আয়—ভুলে থাকতে পারবি।

তারপর কয়েক মাস নির্বিঘ্নে কেটে গেল। এগিয়ে এল সরস্বতী পুজো। হোষ্টেলের পুজো নিয়ে মেতে উঠল সুকান্ত। ফরমাশ দিয়ে নতুন ডিজাইনের ঠাকুর তৈরি করা, আলো দিয়ে সাজানো, জলসার আয়োজন। মোটকথা সব ছেলেদের হোষ্টেলের ঠাকুরকে টেক্কা দেবার নেশায় আহার নিদ্রা ত্যাগ করলো সুকান্ত। ভালভাবেই পুজো ও উৎসব শেষ হল। গোল বাধলো ঠাকুর বিসর্জ্জন নিয়ে। পাড়ার একটা ব্যায়াম সমিতির ছেলেদের সঙ্গে ভাসান নিয়ে বাধলো গণ্ডগোল—শেষে মারপিট। পাড়ার কয়েকজন মাতব্বরের চেষ্টায় ব্যাপারটা হয়তো আপস রক্ষা হয়ে যেত। কিন্তু বেঁকে বসলো সুকান্ত, বললো,—ব্যায়াম চর্চ্চা করে ধরাকে সরা জ্ঞান করে; আজ ওদের রীতিমত শিক্ষা দিয়ে তবে ছাড়বো

শেষ পর্যন্ত পুলিশ এসে গেল। অনেক কষ্টে টেনে হিঁচড়ে সুকান্তকে হোষ্টেলে নিয়ে এলাম। দেখি ওর বাঁ কানটা রক্তে ভেসে যাচ্ছে। রক্ত পরিষ্কার করে দেখা গেল কানটা একেবারে থেঁতলে গেছে। সবাই বললাম—চল একটা ডাক্তার দেখাই। কিছুতেই রাজি হল না সুকান্ত। তুলোয় করে খানিকটা আইডিন জবজবে করে ভিজিয়ে নিয়ে কানটার ওপর চেপে ধরে বললে,—ঠিক আছে।

ঠিক কিন্তু রইল না। পরদিনই সেপ্‌টিক হয়ে দগদগে ঘা হয়ে গেল। সবাই মিলে একরকম জোর করে মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি করে দিয়ে এলাম।

দিন দশেক বাদে ফিরে এল সুকান্ত—কিন্তু বাঁ কানটার পিছনে খানিকটা জায়গা নিয়ে একটা বিশ্রী দাগ রয়ে গেল।

সুকান্ত হেসে বললে,—কিছু না, চুলগুলো একটু বড় রাখলেই ঢেকে যাবে।

বি এ, পাশ করলাম। বাবার এক বন্ধুর সুপারিশে চাকরীতে ঢুকে পড়লাম। বেশীর ভাগ বাঙালী জীবনের চরম ও পরম কাম্য দশটা পাঁচটার কেরাণীগিরি।

সুকান্ত দেখি দিব্বি আড্ডা দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অবাক হয়ে বললাম—এম, এ, ও পড়ছিস না—বাবার কাছেও যাচ্ছিস না, ব্যাপার কি?

হেসে বললে,—টিউসনি করছি। বাবার কাছে যাবার হুকুম পাইনি। বাপ ছেলে সবাই অদ্ভুত। অনেকদিন থেকে ওদের সম্বন্ধে অবাক হওয়া ভুলে গিয়েছিলাম।

কিছুদিন বাদে বিয়ে করলাম। সুকান্ত এলনা। এল বিয়ের পাঁচ ছদিন পরে। কিছু জিজ্ঞাসা করবার আগেই বললে—বউকে ডাক, দেখবো।

বউ দেখলো সুকান্ত দামী একটী লেডিজ হাতঘড়ি দিয়ে। হেসে বউকে বললে,— দশটা পাঁচটা অফিসের পর ঠিক সময় বাড়ি আসে কিনা ঘড়ি ধরে মিলিয়ে নেবেন।

কেরাণীগিরি চাকরীর ওপর সুকান্তর ছিল ভীষণ জাতক্রোধ।

মাসখানেক বাদে। অফিস থেকে ফিরে সবে জামা কাপড় বদলাচ্ছি। সুকান্ত এসেই বললে,—আজ রাতের গাড়িতেই চললামরে।

বললাম,—কোথায়?

—ভাগলপুর।

—কবে আবার ফিরবি?

—বাবার খুব শক্ত অসুখ। এযাত্রা যদি বেঁচে ওঠেন—তাহলে হয়তো ফিরবো একদিন। নইলে—

ইচ্ছে করেই বাকি কথাটা শেষ করল না সুকান্ত। আমিও আর কিছু জিজ্ঞাসা করলাম না। ভাগলপুর থেকে মাত্র একখানা চিঠি পেয়েছিলাম—সুকান্ত যাবার দিন কুড়ি বাদে। ছোট্ট চিঠি—প্রতিটি লাইন তার আজও মনে আছে।

সুকান্ত লিখেছিল—বাবা মারা গেছেন। বিষয় সম্পত্তি সব সমানভাবে উইল করে দিয়ে গেছেন মা ভাই বোনদের মধ্যে। আমায় দিয়ে গেছেন আমার সত্যিকার পরিচয়। যার ফলে এবাড়ির ইঁট কাঠ এমনকি এক মুঠো ধুলোর ওপরেও আমার ন্যায্য অধিকার নেই। বুঝতে পারলিনি? মানে আমি হচ্ছি বাবার যৌবনের অবিমিশ্রকারিতার এক লজ্জাকর জ্বলন্ত উদাহরণ।

সুকান্তর বাবার বিসদৃশ আচরণগুলোর অর্থ অনেকটা স্পষ্ট হয়ে গেল। ··

সংশয়ভরে ডাকলাম—সুকান্ত।

চমকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকল আমার দিকে। চেনবার কথা নয়, তবুও চিনলাম। সুকান্তর ফর্সা রঙের ওপর কে যেন এক পোঁচ কালি ঢেলে দিয়েছে। এক মুখ খোঁচা খোঁচা দাড়ি ·কোটরে ঢোকা চোখ দুটোর নীচে কালি ঢালা। মাথায় রুক্ষ চুল একরাশ, পরণে ময়লা ধুতি; তার উপর বেমানান ময়লা ছেঁড়া ছিটের সার্ট।

বললাম—চেনাই যায় না, ব্যাপার কি?

ব্লড্ টা ছেড়ে দিয়ে আমার দিকে ঘুরে দাঁড়াল সুকান্ত মুখোমুখী হয়ে।

জিজ্ঞাসা করলাম,—কোথায় ছিলি এতদিন?

আড়চোখে চারদিক দেখে নিয়ে মুখখানা আমার কানের কাছে এনে ফিস ফিস করে বললে সুকান্ত জেলে!

অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম শুধু।

সুকান্ত হেসে বললে,—তুই কি করছিস? ছেলেপিলে কটি? থাকিস কোথায়? প্রথম ধাক্কাটা ততক্ষণে সামলে উঠিছি, বললাম,—সেই দশটা পাঁচটার ঘানি টেনেই চলেছি। একটী ছেলে, তিনটী মেয়ে। থাকি শ্যামবাজারে হরিঘোষ ষ্ট্রীটে। কবে এসেছিস কলকাতায়?

—পাঁচ বছর

আবার ধাক্কা খেলাম।

বললাম,—অবাক করলি তুই! পাঁচ বছর এসেছিস অথচ—। কথাটা শেষ করতে দিল না সুকান্ত, বললে,—সত্যি, দেখা করবার দরকারও পড়েনি আর ফুরসৎও পাইনি।

একটু থেমে চোখে একটা বিচিত্র ইঙ্গিত করে বললে,—ওইযে বললাম, বেশীরভাগ সময় ওখানেই কেটেছে কি না।

জিজ্ঞাসা করতে পারলাম না—কেন জেল হয়েছিল। অদম্য কৌতুহল সত্ত্বেও না। শুধু বললাম,—বিয়ে থা করেছিস?

—করেছিলাম। আজ দুবছর হল মারা গেছে। রেখে গেছে একটী মেয়ে আর ছোট ছোট অপোগণ্ড দুটী ছেলে।

—হয়েছিল কি?

আবার ঝুঁকে পড়ল সুকান্ত আমার দিকে। তেমনি কানের কাছে মুখ এনে ফিস ফিস করে বললে,—থাইসিস। একটু থেমে আবার বললে,—বড় মেয়েটার বছর দশেক বয়েস হলেও সংসারের সব কিছু দেখাশুনা করছিল, ছোট ভাই দুটোকে মানুষ করছিল, আজ মাস দুই হল তাকেও ধরেছে। মাতৃসেবা করেছিল কি না।

কি বলবো। বললাম,—একদিন যাস আমার বাড়িতে। বাড়ীর নম্বর রাস্তার নাম বললাম।

চোখ বুজে বার কতক আউড়ে নিয়ে বললে,—ঠিক আছে, যাব। বললাম,—থাকিস কোথায়, কাজকর্ম কি করছিস?

—আহিরীটোলায় একটা বস্তির ভিতর।

ট্রাম বিডন ষ্ট্রীটের কাছ বরাবর আসতেই সুকান্ত বললে —চলি।

অবাক হয়ে বললাম,—এইযে বললি আহিরীটোলায় থাকিস, এখানে নামচিস কেন?

—ডাক্তারের কাছ থেকে মেয়েটার এক্সরের রিপোর্টটা জেনে যাই—যদিও সবই জানা।

পাদানির ওপর গিয়ে দাঁড়াল সুকান্ত। চেঁচিয়ে বললাম,—কি করছিস কিছুই বললি না তো ?

জবাব না দিয়ে মিনিটখানেক হেসে চেয়ে রইল সুকান্ত আমার দিকে, তারপর ট্রাম ষ্টপেজে দাঁড়াবার আগেই ঝুপ করে নেমে পড়ল।

এতক্ষণ বাদে বাইরে দৃষ্টি পড়ল। দেখি অনেকক্ষণ থেকে প্রবল বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। তারি মধ্যে কোথাও না দাঁড়িয়ে ভিজতে ভিজতে বিডন ষ্ট্রীট ধরে সোজা পশ্চিম মুখো চলেছে সুকান্ত।

পরের ষ্টপেজে নামতে হবে আমায়। এগিয়ে এসে দাঁড়ালাম। ট্রাম থামতেই নেমে একটা গাড়িবারান্দার নীচে দাঁড়ালাম। বহুলোক দাঁড়িয়ে। ঘুরে ফিরে মনে পড়ছিল শুধু সুকান্তর কথা। বোধ হয় অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলাম। দেখি রাস্তায় বেশ জল জমে গেছে, বৃষ্টিরও বিরাম নেই। অগত্যা চারগুণ ভাড়ার লোভ দেখিয়ে একখানা রিক্সায় উঠে বসলাম।

বাড়ীতে নেমে ভাড়া দিতে গিয়ে দেখি—সর্বনাশ! মণিব্যাগ নেই। আকাশ ভেঙে পড়ল মাথায়। আজই মাইনে পেয়েছি, দুশো টাকার উপর রয়েছে ব্যাগে। আবার এ পকেট সে পকেট আতি পাতি করে খুঁজেও পেলাম না। হঠাৎ বিদ্যুৎঝলকের মত সুকান্তর মুখখানা মনের কোণে উঁকি দিয়েই মিলিয়ে গেল।

ঝাপসা অস্পষ্ট সব কিছু পরিষ্কার হয়ে গেল, দিনের আলোর মতই।

অসাধারণ

পূর্ণ থিয়েটারের উল্টো দিকেই পপুলার ফার্মেসী—একদিন সকাল বেলায় দোকানের সামনের ফুটপাতে বেশ ভিড়। দলে ভিড়ে দাঁড়িয়ে গেলাম। ব্যাপার কি? পাশের এক ভদ্রলোক বললেন—ওষুধের দাম বেশী নিয়েছে তাই—

যাকে কেন্দ্র করে এই ভিড় তিনি তখন রীতিমত সপ্তমে চড়ে চেঁচাচ্ছেন—মগের মুল্লুক পেয়েছ নাকি? গেল হপ্তায় নিয়ে গেছি দু'টাকা চার আনা আজ বলছ দু'টাকা ছ'আনা, এর মানে কি?

কর্ম্মচারী ছেলেটি পাশে দাঁড়িয়ে চুপি চুপি কি যেন বললে—শোনা গেল না।

ক্রেতা ভদ্রলোক তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন—বাঃ চমৎকার যুক্তি, ওষুধের চাহিদা বেশী—আমদানী কম—কাজেই দাম বেড়ে গেছে। বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে হাঁ করে দাঁড়িয়ে ছিলাম! ক্রেতা আর কেউ নন—আমার তরুণ মনের সবখানি জুড়ে শ্রদ্ধার আসনে বসা অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎ চট্টোপাধ্যায়। ছবিতে দেখেছিলাম—চাক্ষুষ এই প্রথম দেখলাম। প্রথম দেখার ধাক্কা সামলে উঠতে না উঠতে দেখি ভিড়ের মধ্যে থেকে এক ভদ্রলোক কাছে গিয়ে বলছেন—একি শরৎদা—আপনি এখানে?

—আর বল কেন ভাই, এ তল্লাটে একটা ভাল ওষুধের দোকান নেই তাই বালিগঞ্জ থেকে এখানে আসি। তা এরা যা শুরু করেছে—তাতে আর কেনা চলে না—কি বলে শুনেছ—বলে—চাহিদা বেড়ে যাচ্ছে বলে দাম বাড়িয়ে দিচ্ছে।

ভদ্রলোক হেসে বললেন—তুমিও এক কাজ কর দাদা—তোমার বইয়ের চাহিদাও তো বেড়ে যাচ্ছে—দাম বাড়িয়ে দাও।

...র রসিকতায় শব্দ করে হেসে উঠলেন ভদ্রলোক। কোনো
... দিয়ে জোরে পা চালিয়ে ফুটপাতের গা ঘেঁসে দাঁড়ানো
... উঠে পড়লেন শরৎদা।

...গা প্রিয় কৌতূহলী জনতা চিনলও না জানলও না কে
...ন ছুআনা ওষুদের দাম নিয়ে ঝগড়া করতে। কেউ
...রের কেউ ক্রেতার পক্ষ নিয়ে যুক্তিহীন বাদানুবাদ করতে
...র পড়ল। ফুটপাথের ওপর ইলেক্‌ট্রিক পোষ্টে হেলান দিয়ে
...রইলাম।

...স তখন আমার উনিশ কি কুড়ি—যে বয়সে তরুণ-মনে চট্‌করে
..., নেশাও লাগে। বই পড়া (পাঠ্য পুস্তক ছাড়া) ছিল
...একটা নেশার মত। বিশেষ করে শরৎচন্দ্রের উপন্যাস বা
...ওপর ছিল অদম্য ঝোঁক। একটানা শেষ করতে পারবো না
...তাম রাত্রে—সবাই ঘুমুলে। সমস্ত বইখানা শেষ করে চোখ
বুঁজে ভাবতাম অনেকক্ষণ ধরে। আমার কল্পনার রঙিন তুলিতে ফুটে
উঠতেন শরৎচন্দ্র এক অসাধারণ মূর্ত্তি নিয়ে। শ্রদ্ধাপ্লুত কণ্ঠে মনে
মনে বলতাম—তুমি বড়—অনেক বড়—সাধারণ মানুষের স্তরের ঊর্দ্ধে,
অসাধারণ তুমি, নইলে মানুষের দৈনন্দিন সুখ দুঃখ হাসি কান্না বিরহ
মিলনের সূক্ষ্ম তারগুলো নিয়ে এমন নিপুণ হাতে বাজাতে পারতে না।

কল্পলোকের সেই অসাধারণ যাদুকর আজ সাধারণ মানুষের মত
বালিগঞ্জ থেকে ভবানীপুরে এসে দুআনার জন্যে ঝগড়া করে গেলেন—
কল্পনা করতেও ব্যথা লাগে।

আশাহত ভগ্ন মন নিয়ে সেদিন বাড়ী ফিরেছিলাম।

ভাঙামন জোড়া লাগল চার বছর পরে। তখন আমি রঙমহল
থিয়েটারে নিয়মিত অভিনয়-শিল্পী।

শরৎচন্দ্রের 'চরিত্রহীন' মঞ্চস্থ করবার আয়োজন চলেছে পুরোদমে।
নাট্যরূপ দিয়েছেন যোগেশ চৌধুরী। একদিন শুনলাম শরৎচন্দ্র স্বয়ং
আসছেন আজ সন্ধ্যা বেলায় 'নাট্যরূপ' শুনতে। মনোমত না হলে
অভিনয়ের অনুমতি দেবেন না।

ঠিক সন্ধ্যা ৬টায় শরৎচন্দ্র এলেন। কর্ত্তৃপক্ষ সমাদরে অডিটরিয়মে প্রথম সারিতে মাঝখানের চেয়ারটাতে বসালেন ওঁকে। আমরা সব ছোট বড় অভিনেতা অভিনেত্রীরা বসলাম পিছনের সারিতে। আমি বসেছিলাম ওঁর বাঁয়ে দ্বিতীয় সারিতে মাঝের চেয়ারটায়। যোগেশদা ষ্টেজের ওপর বসে পড়তে আরম্ভ করলেন। প্রথম অঙ্কের দৃশ্যের পর দৃশ্য চোখের সম্মুখ দিয়ে ভেসে চলল। শুধু লক্ষ্য করলাম শুনতে শুনতে শরৎচন্দ্র মুখ ফিরিয়ে তাকাচ্ছেন আমার দিকে, কিছু বুঝতে না পেরে বেশ চিন্তিত হয়ে পড়লাম। ভাল করে নাটকের দিকে মন দিতে পারছিলাম না। প্রায় এক ঘণ্টা পনেরো মিনিটে প্রথম অঙ্ক শেষ হল, যোগেশদা মতামতের জন্য শরৎচন্দ্রের দিকে তাকালেন। চোখ বুজে বসে ছিলেন শরৎচন্দ্র, যোগেশদা বললেন—কেমন শুনলেন? উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন শরৎচন্দ্র—চমৎকার পাকা হাতে লেখা আর না শুনলেও ক্ষতি নেই—তবে সবটা শুনবো আমি। একটু থেমে আমার দিকে চেয়ে যোগেশদাকে জিজ্ঞাসা করলেন—এ ছোকরাটী কে? আপনাদের দলের না বাইরের কেউ? রীতিমত ব্যথা পেলাম—অভিমানও হল। তখনকার দিনে নির্ব্বাক চিত্রজগতের একমাত্র প্রিয় দর্শন নায়ক আমি—আমায় ত চিনলেনই না অধিকন্তু এই রকম তাচ্ছিল্যভরা উক্তি। অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে গোঁজ হয়ে বসে রইলাম।

কর্ত্তৃপক্ষের দুতিনজন ছুটে এলেন আমার কাছে। বললেন——শরৎচন্দ্র ডাকছেন তোমায়।

উঠে এসে নমস্কার করে দাঁড়ালাম কাছে। আমার পরিচয় করিয়ে দিতেই মৃদু হেসে শরৎচন্দ্র বললেন—তা হবে, আমি বায়োস্কোপই দেখি না। আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন—বস এখানে।

ঠিক ওঁর পাশের সিটটাতে বসলাম।

ঠিক এমনি সময়ে দক্ষিণ দিকের দরজা দিয়ে অডিটরিয়মে ঢুকলেন তখনকার দিনের লাস্যময়ী শান্তি গুপ্তা। শরৎচন্দ্র হাঁ করে এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন তাঁর দিকে। কাছে আসতেই কর্ত্তৃপক্ষের একজন

আলাপ করিয়ে দিলেন। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে হাসিমুখে শান্তি দাঁড়িয়ে রইল পাশে। শরৎচন্দ্র পাশের সিটটাতে হাত দিয়ে দেখিয়ে বললেন—বস।

ডাইনে বাঁয়ে বসলাম আমি আর শান্তি। ছুহাত দিয়ে ছুজনকে কাছে টেনে শরৎচন্দ্র কর্তৃপক্ষকে উদ্দেশ্য করে বললেন—এই আমার কিরণময়ী আর দিবাকর। এতক্ষণ এই ছুটো চরিত্রই খুঁজছিলাম, পেয়ে গেছি।

এর পরই শরৎচন্দ্রের সঙ্গে পরিচয় আরও নিবিড় হয়ে ওঠে। শরৎদা বলে ডাকি। রোজ সন্ধ্যা বেলায় রিহার্সসালে এসে শেষ পর্য্যন্ত বসে থাকেন। একদিন বললেন—তুমি কোথায় থাক ধীরাজ। বললাম—ভবানীপুর।

শান্তিকে জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি?

—ভবানীপুর।

—বাস রিহার্সালের শেষে তোমাদের ছুজনকে নামিয়ে দিয়ে আমি যাব বালিগঞ্জে।

পথে গাড়ীতে নানা বিষয়ের আলোচনা করতাম শরৎদার সঙ্গে। লোক চরিত্র সম্বন্ধে অদ্ভুত জ্ঞান শরৎদার। কথা তুললেই হল—ব্যাস্ অফুরন্ত কথার তুবড়ি উঠতে লাগল। একদিন কথায় কথায় বললাম —দাদা আপনার আর সব বইয়ের কথা বলছি না—কিন্তু এই চরিত্রহীন বইটা নিয়ে নানা বিরুদ্ধ আলোচনা কানে আসে—

কথা শেষ করতে পারলাম না—ছুধারি তলোয়ার বেরিয়ে এল শরৎদার গলা থেকে, কানে ভেসে উঠল চার বছর আগেকার পূর্ণ থিয়েটারের সামনের ফুটপাথের সেই ঝগড়ার সুর। শরৎদা বেশ উত্তেজিত হয়েই বললেন—জানি জানি—শালারা বলবেই। কারা বলবে জান? যাদের সর্ব্বাঙ্গে দগদগে ঘা। আমাদের সমাজের অবস্থাটা কি হয়েছে জান? দোষ ত্রুটি সব ধামা চাপা দিয়ে বক ধার্ম্মিক সেজে মুখে বড় বড় ধর্ম্মের বুলি আউড়ে বেড়ানো। আমি নিজে দেখেছি হোটেলের ঝিএর পিছনে হ্যাংলা কুকুরের মত ঘুরে

বেড়িয়ে শেষকালে তার লাথি খেয়ে দল পাকিয়ে অন্য লোকের ঘাড়ে বদনামের বোঝা চাপিয়ে—ঝিটাকে হোটেল থেকে তাড়িয়ে দিতে। কিরণময়ী দিবাকরের উদাহরণও খুঁজলে অনেক ঘরেই পাবে তুমি—কিন্তু আসল কথা হচ্ছে খুঁজো না ওসব, ধামা চাপা দিয়ে চোখ বুঁজে চলে যাও। এই ধামা চাপা দিতে দিতে এক দিন এ জাতটাই ধামা চাপায় পড়বে।

আজ আর এক নতুন চোখে দেখলুম শরৎদাকে—মনে মনে বললাম—সাধারণ মানুষের স্তরের ভিতর থেকেই তুমি অসাধারণ। নইলে সমাজের এই ক্ষত মানুষের দোষ ক্রটিগুলো এমনভাবে নিষ্ঠুর কলমের খোঁচায় সবার চোখের সামনে তুলে না ধরে—শুধু তাদের জয়গানে আকাশ বাতাস মুখরিত করে তুলতে তুমি।

শরৎদার গলায় তখনও বিদ্রোহের সুর, বললেন—সেবার রেঙ্গুন থেকে সবে ফিরেছি কলকাতায়—

বেশ একটু সঙ্কোচের সঙ্গে বললাম—দাদা—

ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন শরৎদা—শুনে যাও হে ছোকরা। বাধা দিও না। আমাদের সমাজের অফুরন্ত কেচ্ছা কাহিনী।

বললাম—দাদা গাড়ি অনেকক্ষণ আমার বাড়ির কাছে দাঁড়িয়ে আছে; রাতও বারটা বাজে, আজ বরং আসি, কাল শুনবো।

হঠাৎ নিভে গেলেন শরৎদা—বললেন তাইত খেয়ালই হয়নি। আচ্ছা আজ তুমি যাও—আর এক দিন শুনো—আমার গল্প উপন্যাসের মসলা সবই সংগ্রহ করেছি আমাদের সমাজ জীবন থেকে—কোনোটাই কল্পনা করে সৃষ্টি করতে হয়নি।

নামবার আগে পায় হাত দিয়ে প্রণাম করতেই হঠাৎ ঝেঁজে উঠলেন শরৎদা—এ সব বুজরুকি শুরু করলে কেন, মতলবটা কি?

হেসে বললাম—বুজরুকি, মতলব কিছুই নয় দাদা—হঠাৎ গায়ে পা লেগে গিয়েছিল [illegible] গাড়ি নেমে দরজা বন্ধ করে বাড়ী চলে এলাম।